# শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
নববর্ষ সংখ্যা
২০২৬

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী ঁসুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

# শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

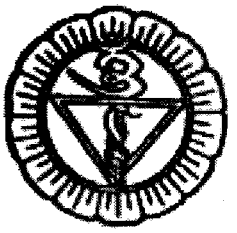

৬৫ তম বর্ষ ● শুভ নববর্ষ ১৪৩৩ সন ● প্রথম সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| সতাং প্রসঙ্গ | শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ | ১ |
| গীতার মর্ম (পরবর্তীঅংশ) | শ্রীদেবপ্রসাদ রায় | ৪ |
| শ্রদ্ধাঞ্জলি | | ৭ |
| শ্রদ্ধাঞ্জলি | | ৮ |
| বিশেষ বিজ্ঞপ্তি | | ৯ |
| যুবকদের প্রতি | স্বামী সুপর্ণানন্দ, সেক্রেটারী রামকৃষ্ণমিশন (গোলপার্ক) | ১০ |
| অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী (পরবর্তী অংশ) | শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর | ১২ |
| শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরীমা ভক্তের অনুভবে—তৃতীয় পর্ব | শ্রীসোমনাথ সরকার | ১৪ |
| স্মৃতির পাতা থেকে | শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায় | ১৬ |
| 'নাম নামী অভেদরে' | শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক | ১৮ |
| দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী | | ২০ |
| পুণ্য-পরশ-পুলক (২২শ পর্ব) | শ্রীবসুমিত্র মজুমদার | ২২ |
| "এসো প্রাণ হরণো' | শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল | ২৪ |
| MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 10-10-2025 to 10-02-2026) | | ২৬ |
| দেবী বর্গভীমা | শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায় | ২৮ |
| সুস্বাগতম্ ১৪৩৩ (সম্পাদকীয়) | | ৩০ |

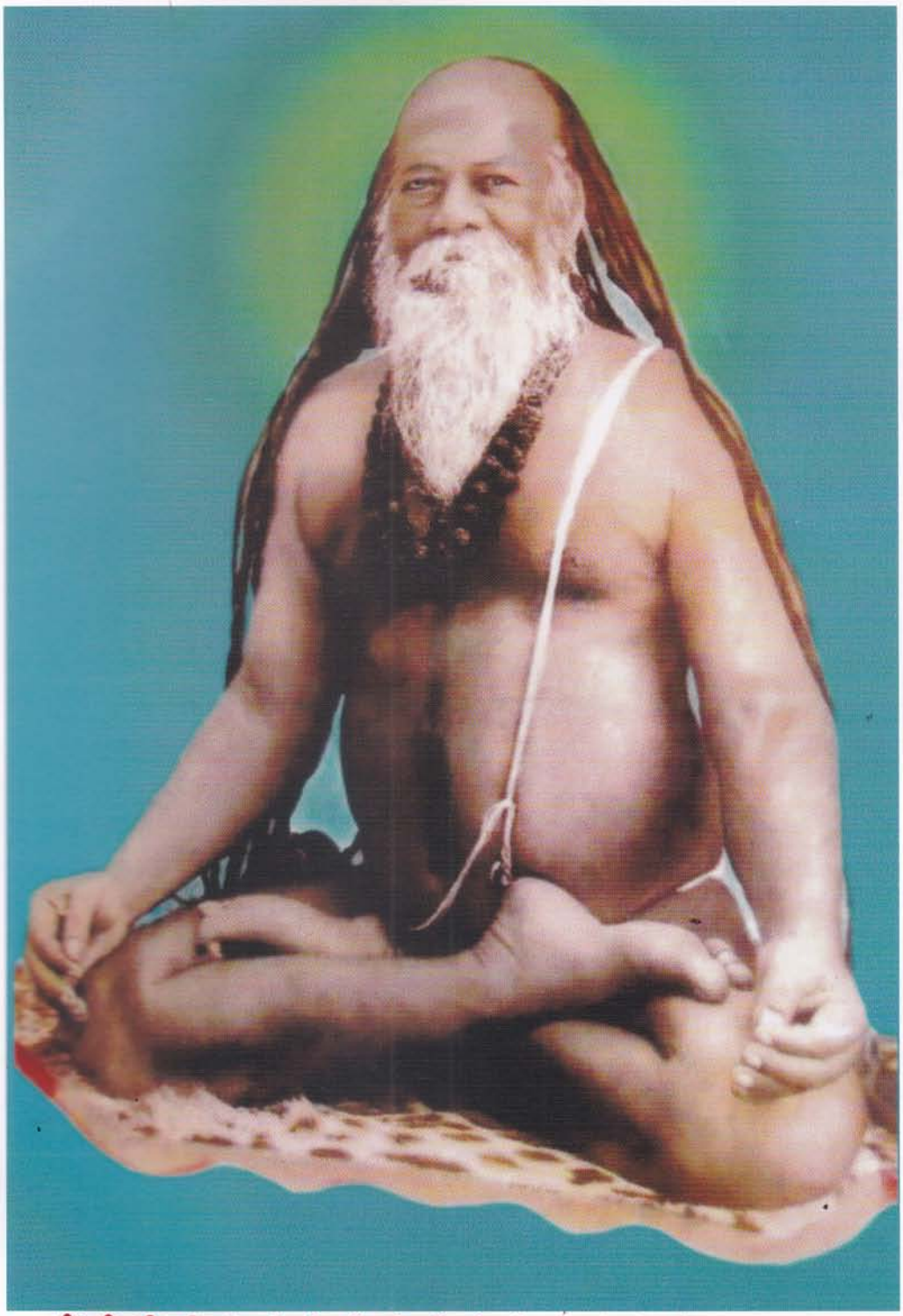

পরম শুভানুধ্যায়ী জনৈক শিষ্য।

# সতাং প্রসঙ্গ

## শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

"মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠনাথ মোহয়ন্নিব মায় য়া—"

শ্রীমদ্ভাগবতের সেই তাঁর হাসির রূপবর্ণনা:—"সেই মৃদুমধুর স্মিত হাস্য দর্শনে বিশ্বচরাচর আনন্দে মোহাভিভূত হয়।" কিন্তু আজকের তাঁর এই চেষ্টাকৃত হাসি আর এই সবগল্প—এ যেন কেবলই নিজেকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা। তাইজন্যে নীরবে ব্যথিত হৃদয় হতে ধ্বনিত হচ্ছিল:—

"তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল?
বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখিজল!
প্রভু! বুঝেছি মোরা তোমার এ যে নিগূঢ় ছলনা—
যে কথা তুমি বলিতে চাও, সে কথা তুমি বলোনা।"

সেবারে ভাব সমাধির পরেই ভাগলপুরে যেয়ে যে কয়েকদিন আমাদের নিকট ছিলেন, তিনি এই রকম ভাবেই ছিলেন। কতবার গুণ গুণ করে সুরের গুঞ্জন তুলে কীর্ত্তনে নিজে গাইবার কতই চেষ্টা করেন, কিন্তু সে প্রয়াস সফল হয় না। গান গাইতে বসলেই নয়নে জল আসে, গলা ভেঙ্গে যায় অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে রবিকে ইঙ্গিত করেন; "তুমি গাও।" আজও ট্রেণে যত কথা বলেন সৎ-প্রসঙ্গে, তার মাঝেও যেন এই ভাবেরই আবেশ ছিল। তাই জন্যে এই পূর্ব্বাভাসটুকু বলে রাখলাম।

আমরা তাঁর গল্প করতে করতে যাচ্ছি, শ্রীশ্রীমহারাজ আবার আমাদের তাঁর কামরায় ডেকে পাঠালেন। সময় তখন বোধহয় বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। ট্রেণ রামপুরহাট ষ্টেশন থেকে ছাড়লো। ভক্ত সমাগম এখনকার মত শেষ হয়েছে। বোধহয় সাঁইথিয়া এবং বোলপুরে আবার ভক্ত সমাগম হবে তাঁর দর্শনের জন্য। এখন আমরাই কয়েকজন ছাড়া তাঁর কামরায় বিশেষ কেউ নেই। ভক্ত আগমন উপস্থিত মত শেষ হওয়ার পর তাঁর কামরার মেঝেটি মুছে পরিষ্কার করে ধূপকাঠি জ্বেলে দিয়েছি। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর শ্রীচরণ দু'খানি প্রসারিত করে দিয়ে, নীরবে জানালা দিয়ে চেয়ে আছেন বাইরের দৃশ্যের দিকে। তাঁর রক্তিম চরণ-প্রান্তে বসে রয়েছি। কালের বালুবেলায় এই অমরাবতীর ক্ষণকালটুকু হারিয়ে কেন যেতে দেব? কতটুকুই বা এর স্থিতি! এখনই তো ভীড়ের কোলাহলে তা মিলিয়ে যাবে। তাই সাহসে ভর করে তাঁর চরণ পানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জিজ্ঞেস করলাম :—"আর একটু পরেই তো নেমে যাব। দূরে চলে যাবার সময় হয়ে এ'লো। কিন্তু দূরে যেয়েও কী করে আপনার সঙ্গে সর্ব্বদা যোগ রাখব?

শ্রীশ্রীমহারাজ :—"যোগ তো মনে। এ দেহের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন নিজের যে এতপ্রিয় দেহ, তার সঙ্গেও তো তেমন যোগ থাকে না। আসল যোগ মনে। বাইরের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক নেই।"

শ্রীশ্রীমহারাজ এক কথায় আমাদের প্রশ্ন নাকচ করে দিলেন। কিন্তু আমাদের মনে ধ্বনিত হ'তে

থাকলো, মানুষেরই দেহ প্রাকৃত, আত্মা নিত্য। তার দেহে অভিনিবেশ নিন্দনীয়। কিন্তু কৃষ্ণের 'দেহ দেহী'—ভেদ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—"কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যের সিন্ধু।" শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীঅঙ্গের প্রতি অণুপরমাণু চিন্ময়। এই সান্দ্রাঙ্গ সচ্চিদানন্দ ঘন মূর্তি যত দর্শন হয় ততই "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।" কিন্তু এত কথা তাঁর সামনে বলি এমন সাধ্যই নাই। তাই বললাম ঃ— "মহারাজ! যতই বলুন! "যোগ শুধু মনে।" তবু কিছুদিন আপনার দর্শন বিরহিত হলেই আমাদের দুরবস্থা এত হয় কেন? বিনা চেষ্টায় বিনা সাধনায় শুধু আপনার শ্রীচরণতলে থাকলেই আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব যে উচ্চলোকে থাকে—আবার সংসারে ফিরে এসে সেই রেশ চিরস্থায়ী কেন হয় না? কি করলে, কি ভাবে চললে সর্ব্বদা আপনার সহিত যোগ অবিচ্ছেদ হয়? এবং সেই রেশ স্থায়ী হয়? সংসারের নানা অসুন্দরতার মাঝে ফিরে যেয়েও সেই চিরসুন্দরের স্পর্শ কেমন করে অটুট থাকবে?"

শ্রীশ্রীমহারাজ:— "যতক্ষণ একেবারে তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে না পারছ ততক্ষণ সংযোগ আর বিয়োগ আছে। বস্তুতঃ তিনি আর জীব দুই তো আলাদা নয়। তিনিই সর্ব্বভূতের মধ্যে লীলা করছেন। সকলের মধ্যে সেই তিনি। তাঁকে কি বলে বোঝাবে? তাঁকে শুধু 'সুন্দর' বললেই যে তাঁকেও সীমাবদ্ধ করা হয়। তিনি বিভু বস্তু, তাঁর সীমাকরণ করা সম্ভব নয়। এইমাত্র তুমি যা বললে— অসুন্দরের মাঝেও সুন্দরকে উপলব্ধি করা— সে কথাটাও একহিসাবে প্ল্যাটিটীউড্ (platitude) কথার কথা মাত্র। সেই সত্যদৃষ্টির বিকাশ হলে অসুন্দর বলে এই ত্রিভুবনে আর কিছুই থাকবে না। সবের মাঝেই তাঁকে দেখবে। তিনি সুন্দর, অসুন্দর সূক্ষ্ম, স্থূল— সবই তিনি। তিনি অণু হতেও অণু— কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করে— তার চেয়েও সূক্ষ্ম।

আবার তিনিই মহৎ হতেও মহৎ "অণরোণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" কাজেই তাঁর সীমাকরণ করা সম্ভবপর নয়। তার চেয়ে সদাসর্ব্বদা তাঁকেই চিন্তা কর। অবিচ্ছিন্ন অবিশ্রান্ত তাঁর স্মরণে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হবে। তখন আর চেষ্টা করে তোমাকে ভালো হতে হবে না। ভালো হয়েই যাবে। তাঁরই উপর সব নির্ভর কর, সব ভার ছেড়ে দাও। তুমি তাঁকে দেখবে, তাঁকে সম্ভোগ করবে, এইকামনার মধ্যেও স্ব-সুখময়ী বাসনা আছে। আর এ কামনাও বিসর্জন দিয়ে তাঁর উপর সব ভার ফেলে দিয়ে তাঁর যখন ইচ্ছা তিনি দর্শন দেবেন। এই মনোভাবই অবলম্বন কর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপমা—বিড়ালছানার মাকে ধরা আর বাঁদর ছানার মাকে ধরা মনে আছে তো? তুমি চেষ্টা করে তাঁকে আর ধরবে কি! তাঁর উপর সব ভার ছেড়ে দিলে তিনি নিজে এসে তখন হাত ধরবেন। দু'টি আছে। একটি পূর্ব্বরাগ আর একটি অনুরাগ। পূর্ব্বরাগেও 'আমিত্ব' বোধ একেবারে যায় না। পূর্ব্বরাগেও স্ব-সুখময়ী বাসনা থাকে। আমি তাঁকে সম্ভোগ ক'রব। আমার কত রূপ কত গুণ— আমি নিজেকে নানাবিধ রূপে সজ্জিত করি যাতে তাঁর উপযুক্ত হতে পারি, তাঁর মনে ধরে। এরূপ মনোভাব হলো পূর্ব্বরাগের। আর অনুরাগে এ সকল বোধই লুপ্ত হয়ে যায়। তিনি দয়া করে ডেকেছেন। তাঁর বেণুরবের আহ্বানে সাজ, অসাজ, ভালো মন্দ, যোগ্যতা অযোগ্যতা সকলই নিশ্চিত হয়ে মুছে গেছে। যিনি বেনুদ্বারে আকর্ষণ করেছেন তিনিই তাঁর অহৈতুকী করুণায় গ্রহণ করবেন। সাজের আর কিসের দরকার? আকুলিত চিত্ত সব চিন্তা ভুলে একমুখী হয়ে শুধু তাঁর পানে ছুটে চলেছে। এইটি যখন হবে তখনই নিজের নিজত্ব একেবারে মুছে যাবে। নিজেকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা, নিজের যোগ্য অযোগ্য বিচার, নিজে তাঁকে দেখব তাঁকে সম্ভোগ করব, এসব বাসনাও

আর থাকবেনা। তাঁর ইচ্ছা যখন কাছে ডাকবেন, না হয় যদি ইচ্ছা, ডাকবেন না। তাঁর যা খুসী। আমার চাইবার কিছুই নেই।"

শ্রীশ্রীমহারাজ যেন ভাবময় হয়ে কথাগুলি বলছিলেন। এখন ক্ষণকাল চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছেন। চলন্ত ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিও যেন চলমান। "পরমপ্রজ্ঞা" আর এই অনন্ত গতিশীলতা একই। তাই কি মহারাজ এত দ্রুত গতিশীলতাই ভালোবাসেন। অবিশ্রান্ত গতির মাঝেই যেন তার আনন্দ। পাছে তিনি চুপ করে যান, আর কিছু না বলেন তাই ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম:—"আচ্ছা বাবা, শ্রীপাদনিত্যানন্দ—তিনি তো মহাপ্রভুর অভিন্ন কলেবর ছিলেন। তাঁকে পর্যন্ত মহাপ্রভু কতবার নিষেধ করে বলে- ছিলেন: "শ্রীপাদ! জীব উদ্ধারের কার্য্য ফেলে বার বার আমাকে দর্শন করতে ছুটে এসোনা।" কিন্তু তবু তো শ্রীনিত্যানন্দ দূরে থাকতে পারতেন না। তাঁরই যদি এই রূপ হয় তবে অতিক্ষুদ্র জীব আমাদের কী গতি হবে? আপনি বলে দিন। আমাদের আপনার নিকট হতে দূরে গেলেই মনে হয়, এত যে দেখে এলাম তবু কখনো যেন দেখিনি।"

শ্রীশ্রীমহারাজ:—"শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মাঝেও দূরত্ব ছিল। তাঁর সঙ্গে অভেদ হতে হবে। ভক্তই অভেদ। ভক্ত ভগবান এক। তাই জন্যে, শ্রীমদ ভাগবতে আছে:— ভগবান কৃষ্ণ উদ্ধব কে বলছেন:—সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমনকি আমার নিজ আত্মাও আমার কাছে সেরূপ প্রিয় নয়, ভক্ত আমার কাছে যেরূপ প্রিয়। ঐ যে বললাম, ভক্ত ভগবান এক। তিনি নিজেই নিজ মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য একই বস্তু, ভক্ত ভগবান রূপে দ্বিধাবিভক্ত হলেন। আর শ্রীরাধাই হচ্ছেন সমষ্টিভূত ভক্তের সারনির্যাস। ভক্ত শ্রেষ্ঠা—কৃষ্ণ আরাধনার মূর্তিমতী বিগ্রহ!"

শ্রীশ্রীমহারাজের কথা শুনে আমাদের চমক্ লাগলো। মাত্র ৫/৬ দিন পূর্ব্বে ৭ই জানুয়ারী কলিকাতায় আঠারোবাড়ীর কীর্তন মণ্ডপে তাঁর যে দীর্ঘকালব্যাপী ভাব সমাধি হ'য়েছিল, তারপর থেকে তিনি যেন নিরন্তর রাধাভাবেই ভাবিত হয়ে আছেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বলতে লাগলেন—

শ্রীশ্রীমহারাজ:—"ভগবানে মমতা বুদ্ধি করতে হবে। সেইটি হলে তখন ভগবানকে জীবন দিয়ে ভালোবাসবে অথচ তাঁর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছ নিজে যা খাচ্ছ, খেতে দিচ্ছ—তবু তিনিই জীবন সর্ব্বস্ব। দূরত্ব নেই, ভেদ নেই।"

আজ দেখছি শ্রীশ্রীমহারাজ ভাবের একেবারে উচ্চগ্রামে।

ooo

# গীতার মর্ম (পরবর্তীঅংশ)

## শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের মূল কথা কী তা আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই কথাটি হচ্ছে দেহ আর দেহীর ভেদ। এই তথ্যটি প্রথমেই তিনি স্মরণ করিয়েছেন এখানে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। ২/১৩

এই দেহের সঙ্গে দেহীকে বা আত্মাকে, দেহের মধ্যে যিনি কাজ করছেন, তাঁকে আমরা এক করে বসে আছি। সুতরাং আত্মজিজ্ঞাসার মূল কথা হল দেহ থেকে পৃথক করে আত্মাকে উপলব্ধি করা, চেনা বা জানা।

এই যে দেহ দেহীর ভেদ বা পার্থক্য-বোধ, এই বোধই তিনি প্রথম সঞ্চার করতে চাইলেন শিষ্যের মধ্যে। তারপর সেই আত্মার নানারকম লক্ষণ ভগবান অর্জুনকে শোনালেন এবং সেই লক্ষণের দ্বারা আত্মার অজড়ত্ব, অমরত্ব ইত্যাদি তিনি প্রতিপাদন করলেন, বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সেই বোঝাবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রথমে তাকে দেখালেন, এই যে দেখছ দেহ, আর এই যে দেহী, এ দুটি কিন্তু আলাদা তত্ত্ব, পৃথক জিনিস। তুমি দেহের নানারকম সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ ইত্যাদি সব দ্বন্দ্ববোধের দ্বারা বিহ্বল হচ্ছ কেন? দেহ আজ আছে, কাল নেই 'আগমাপায়িনোঽনিত্যঃ (১৪)।

এজন্য সাধককে প্রথম যে সাধন অবলম্বন করতে হবে, তা হল তিতিক্ষা ও ধীরতা। ঐ যে আমরা দেখলাম, জাগালেন ও 'উত্তিষ্ঠ' বলে। জাগানোর পরে আমি দেখলাম, ভয়ানক জ্বালা। ঘুমিয়ে ছিলাম যতদিন, বেশ ছিলাম আরামে। সুতরাং ঘুমটাইতো ভালো।

২/১৩ অনুবাদ—দেহী এই দেহেতেই যেমন কৌমার (বাল্যাবস্থা), যৌবন (তরুণ), ও জরা, এই তিন অবস্থা পেয়ে থাকে, দেহান্তর প্রাপ্তিও (সেইরকম একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র)। ধীর পুরুষগণ তাতে বিমুগ্ধ হন না।।

ব্যাখ্যা-লৌকিক আভাসে 'দেহেরই সহিত আত্মার জন্ম ও মরণ হয়;' যাতে এইরকম ভ্রম অর্জুনের মোহবৃদ্ধি না হয়, সেইজন্য ভগবান বলছেন, ত্রিকালে ত্রিলোকে যত প্রকার দেহ সম্ভব হয়, যিনি সেই সমস্ত দেহই ধারণ করে থাকেন, তিনিই দেহী। একই আত্মা বিভুরূপে সর্বদেহেই বিরাজমান। আত্মা এক, এজন্য এ শ্লোকে দেহিনঃ একবচন পদের প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু দেহ 'বহু' এই অর্থে আগের শ্লোকে 'সর্বেবয়ং' এই বহুবচন পদ প্রযুক্ত হয়েছে। আধারকে দেহ বলে।

(এই শ্লোকটিতে এবং পরের শ্লোকটিতে সৃষ্টিতত্ত্ব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এত সংক্ষেপে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব আর কোথাও বলা হয়েছে বলে মনে হয়না। এই দুই শ্লোকের মর্ম সুন্দররূপে উপলব্ধি করতে পারলে সাংখ্য যোগে অধিকারী হওয়া যায়।)

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।। ২/১৪

মাত্রাস্পর্শা ঃ— বিষয়ের **অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে** মীয়তে অর্থাৎ প্রমাণিত হয় বলে তাদের অপর নাম মাত্রা। ইন্দ্রিয়ের **সহিত বিষয়ের সংসর্গ।**

আগমাপায়িন ঃ— **উৎপত্তি বিনাশশীল।** তান্ তাদেব। তিতিক্ষস্য-সহ্য করবে।

—হে কৌন্তেয়! **ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিচয়ের** সংসর্গ শীতোষ্ণাদির ন্যায় সুখ ও দুঃখদায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু হে ভারত! সমস্তই **অনিত্য। অতএব** তাই বুঝে সহ্য করছি তোমার কর্তব্য। অর্থাৎ এইরূপ ইষ্টনিষ্ঠাও অনিত্য তজ্জন্য **হর্ষ-বিষাদ না করে** তা ধীরভাবে সহ্য করবে।।

যার দ্বারা বিষয় **জানা যায়, সেই** চক্ষু-আদি-ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নাম মাত্রা। ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে বিষয় সম্বন্ধের নাম মাত্রাস্পর্শ।

আগম-**উৎপত্তি ও অপায়-বিনাশ** বিশিষ্ট। এইজন্য শীতোষ্ণাদি বা হর্ষবিষাদাদি কিংবা ইষ্টনিষ্ঠাদি সমস্তই অনিত্য। **মনে হতে পারে,** অন্তঃকরণ বিচারযুক্ত, তার সঙ্গে নির্বিকার নির্গুণ আত্মার সম্বন্ধ কী? একো দেবোসর্বভূতেষু **গূঢ়ঃসর্বব্যাপী** সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাদিবাসঃ সাক্ষী কেবলা নির্গুণশ্চ।।

—অদ্বিতীয় **জ্যোতিঃস্বরূপ** পরমাত্মা সর্বপ্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, তিনি সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, **কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতের** নিবাস স্থল, **সর্বসাক্ষী** চেতয়িতা, নিরূপাধিক ও নির্গুণ।

—**আত্মা সর্বসাক্ষী,** চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও নির্গুণ। অনিত্য অন্তঃকরণের সুখ দুঃখাদি ধর্মনিত্য, নির্বিকার **আত্মা আশ্রয়** করতে পারেনা। যেহেতু নিত্য ও অনিত্য এই বিরুদ্ধ পদার্থদুটির ধর্ম এক হবার উপায় **নেই। অন্তঃকরণ** ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন বলে আত্মার ভেদ কল্পনা করা মহাভ্রম।

**এখানে অর্জুনের** মনে প্রশ্ন জেগেছে, যুদ্ধ করা আর না-করা এরমধ্যে কোন্‌টি ভালো? ভগবান উত্তর **করছেন, সন্দেহ** দোলার ঐ দুটি প্রান্তই মন্দ। সংশয় ভূমিকাটিই দোষযুক্ত।

**বাঁচা আর মরা** কোন্‌টা ভাল? ভগবান বলেন দুইটাই মিথ্যা। দুটোই মাত্রাস্পর্শাঃ, দুটোই আগমাপায়িনঃ, **দুটোই আদ্যন্তবন্তঃ** (আদি ও অন্তযুক্ত)। এর একটাও ভালো নয়। বাঁচা ও মরা এই দ্বন্দ্বের আড়ালে যে **একটি দ্বন্দ্বাতীত** তত্ত্ব আছে, তার সন্ধান যে জানে, সে মরলেও বেঁচে থাকে, যে না জানে সে জীবন্ত **হলেও** মৃতের সামিল।

**যতক্ষণ** মানুষের কাম্যবস্তু একাধিক অর্থাৎ দুই বা ততোধিক, ততক্ষণ দ্বন্দ্ব আছেই। এ থেকে মুক্তি **পাবারও উপায়** চিত্তকে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে নিয়ে যাওয়া।

**সকল** দ্বন্দ্বের অতীতে একটা পাওয়া আছে। তাকে সবখানি জীবন দিয়ে চাইতে ও পেতে হবে। যা পেলে আর সব পাওয়া মিটে যাবে। যা পেলে আর সকল রকম প্রাপ্তি, সকল প্রকারের লাভ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হবে। এমন একটি বস্তু খুঁজতে হবে যা পেলে আর কোন লাভকেই কম বলে মনে হবে না। যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। (গীতা ৬/২২)—যে অবস্থা লাভ করে যোগী অন্য লাভকে অধিক বলে বোধ করেন না।

যতক্ষণ জীবনের লক্ষ্য (End) একাধিক বস্তু, ততক্ষণ দ্বন্দ্ব আছে, ঘাত প্রতিঘাত আছে, তাপ-জ্বালা-দুঃখ অশান্তি আছে। যখন একটি মাত্র সবচাইতে বৃহত্তম ও মহত্তম (End) এর দিকে লক্ষ্য পড়েছে ও অন্যান্য

লক্ষ্যগুলি সেই পরম লক্ষ্যের উপায় রূপে (Means) দৃষ্টি হচ্ছে, তখনই শান্তির তোরণ উন্মুক্ত হচ্ছে। জীবনে একটি Goal বা সাধ্য বস্তু চাই—যা হবে জীবনের যথাসর্বস্ব। আর যা কিছু সব শুধু তারই জন্য। যা যা সেই সাধ্য বস্তুকে পাবার অনুকূল এবং যতটুকু অনুকূল, ঠিক ততটুকুই হবে চাওয়া ও পাওয়া। স্বাস্থ্য চাই, অর্থ চাই, বিদ্যা চাই, সমাজ চাই, পরিবার চাই, রাষ্ট্র চাই, স্বর্গসুখ চাই, সবকিছুই চাই। এইসবকিছু পাওয়া পর্যন্ত দ্বন্দ্বের ভূমির ঊর্ধ্বে উঠবার উপায় নেই। সেই পরম কিছুর জন্য যখন সব-কিছু, তখনই দ্বন্দ্বের ভূমিকা চলে যাবে। সেই একটি পরম কিছু পাবার পক্ষে যা যা প্রতিকূল, তা যত মূল্যবানই হোক না কেন, কিছুতেই সে সকল চাইনা। এই রূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন নীতি অবলম্বন করলে দ্বন্দ্বের অবসান।

ক্রমশঃ

ooo

## আলোর ঠিকানা

### শ্রীমতী মেখলা দত্ত

পথের পাশে পথের বাঁকে বন্ধু আমার লুকিয়ে বসে,
ভয়কি আমার বিপদএলে প্রকট হবেন নিজেই এসে।
প্রকট হবেন ছদ্মবেশে
বন্ধু কিংবা শত্রুবেশে।
হঠাৎ আসা বিপদথেকে উঠবে হেসে ভবিষ্যতে,
ছদ্মবেশের আড়াল থেকে বন্ধু আমার হাতটি ধরে
বলবে এস "ভয় কি তোমার?
থাকবো আমি তোমার পাশে।"
বলব আমি—
"ভয় পাইনি, ভাবছি কেবল
চাইনি কেন তোমার দিকে?
ছদ্মবেশী বন্ধু আমার কোথায় তোমার ময়ূর পালক?
কোথায় তুমি বংশীধারী? এ যে কেবল পথিক পথের
মিলটি কেবল বাঁকা ঠোঁটের।"
ছদ্মবেশী বন্ধু আমার, হাতটি ধরো
নিয়ে চলো আলোর স্রোতে।

## শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

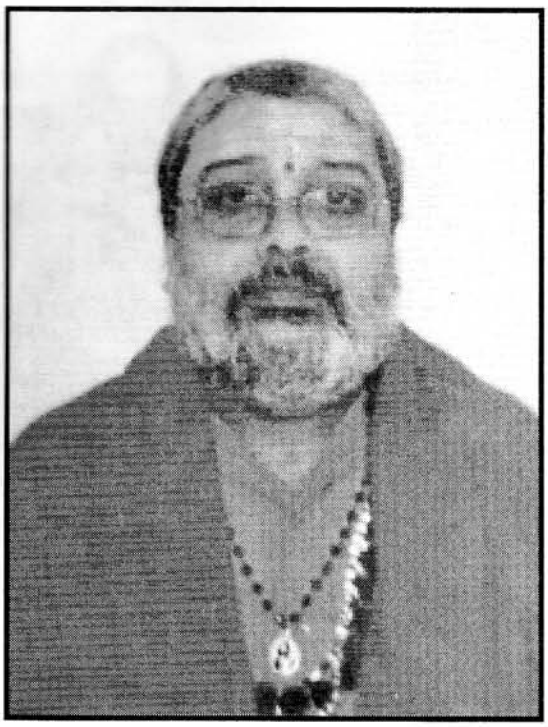

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে ব্যক্ত করছি দেওঘরে অবস্থিত আমাদের শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমের ব্রহ্মচারী তথা শ্রীশ্রীবালেশ্বরী দেবীমাতার সেবাইত শ্রীমৎ সম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারী ২০২৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর, বাংলার ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সনে ইহলোক ত্যাগ করে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর চরণে আশ্রয় লাভ করেছেন।

অনেক ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আশ্রমে যাতায়াত ছিল এবং শ্রীগুরুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তিনি এই ব্রহ্মচারীর জীবনকে বেছে নেন। ১৯৮০ সালে তিনি শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজজীর কাছে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হন। ১৯৯১ সালে স্বয়ং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী তাঁকে শ্রীশ্রীবালানন্দ ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টীপদে মনোনীত করেন। ২০১৩ সালে শ্রীদর্শনানন্দজীর দেহাবসানের পর তাঁকে শ্রীশ্রী দেবীমাতার সেবাইত পদে নিযুক্ত করা হয়।

সুদীর্ঘ ৪৫ বছরের আশ্রমিক জীবনে তিনি আশ্রমের যাবতীয় কাজ সুনিপুণ হস্তে পরিচালনা করে গেছেন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর রীতি পরম্পরাকে মান্যতা দিয়ে তিনি আশ্রমের সকল অনুষ্ঠান সম্পাদনা করে গেছেন।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজজীর শ্রীচরণে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

*আশ্রম কর্তৃপক্ষ*

## শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

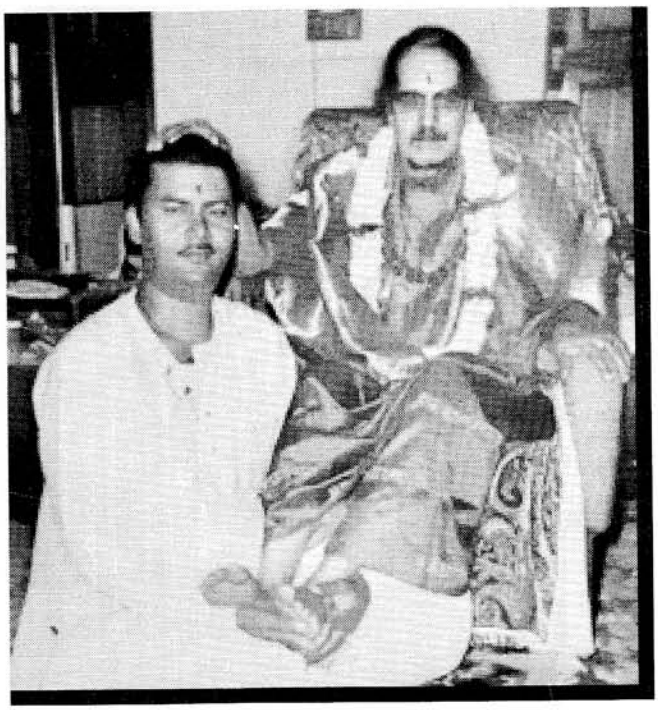

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে, ৺নবকুমার চন্দ্র সজ্ঞানে গত ১৫ই জানুয়ারী ২০২৬, শ্রীগুরুচরণে প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালের দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রম দেওঘরে তিনি দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজীর একনিষ্ঠ সেবক ও গুরুগত প্রাণ ছিলেন। তাঁর বিশেষ কর্মদক্ষতায় তিনি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর আস্থা অর্জন করেন এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী তাঁকে সকল ট্রাস্টের ট্রাস্টী ও শ্রীশ্রীমোহন মন্দির আশ্রম ট্রাস্টের ম্যানেজিং ট্রাস্টী পদে মনোনীত করেন। তিনি সেই দায়িত্ব আমৃত্যু পালন করেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ৺নবকুমারবাবুর সাঁইথিয়ার পৈর্তৃক বাড়িতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা করেছিলেন। এছাড়া অন্যান্য উৎসবেও ৺নবকুমারবাবু ও তাঁর পরিবারের অবদান ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীচরণে পূর্ণ জীবনপ্রাপ্ত প্রবীণ ট্রাস্টীর আত্মার চির শান্তি প্রার্থনা করি।

*আশ্রম কর্তৃপক্ষ*

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১) বিগত ১১/১১/২০২৫ **তারিখে শ্রীশ্রীবালানন্দ** ট্রাস্টের বিশেষ জরুরী সভাতে (meeting) শ্রীমৎ দীনেশানন্দ ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীবালানন্দ **ট্রাস্টের ট্রাস্টীপদে মনোনীত** করা হইয়াছে।

**শ্রীমৎ সম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারী-ম্যানেজিং ট্রাস্টী** ও সেবাইত।

**শ্রীসুরজিৎ দে (ট্রাস্টী)** **শ্রীনবকুমার চন্দ্র (ট্রাস্টী)**
**শ্রীপার্থসারথী চন্দ্র (ট্রাস্টী)**

২) বিগত ২৫/১২/২০২৫ **তারিখে শ্রীশ্রীবালানন্দ** ট্রাস্টের বিশেষ জরুরী সভাতে (meeting) শ্রীমৎ পবিত্রানন্দ ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীবালেশ্বরী **দেবীমাতার সেবাইত** ও শ্রীশ্রীবালানন্দ ট্রাস্টের ট্রাস্টীপদে মনোনীত করা হইয়াছে। শ্রীসম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারীর পরলোকগমনে **শ্রীশ্রীবালানন্দ** ট্রাস্টের ট্রাস্টী ও সেবাইত পদের শূন্যস্থান পূরণ করা হইল।

**শ্রীসুরজিৎ দে (ট্রাস্টী)** **শ্রীমৎ দীনেশানন্দ ব্রহ্মচারী (ট্রাস্টী)**
**শ্রীনবকুমার চন্দ্র (ট্রাস্টী)** **শ্রীপার্থসারথী চন্দ্র (ট্রাস্টী)**

৩) বিগত ২৮/০১/২০২৬ **তারিখে** শ্রীশ্রীমোহনমন্দির আশ্রমে ট্রাস্টের বিশেষ জরুরী সভাতে (meeting) শ্রীমৎ পবিত্রানন্দ **ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীমোহন মন্দির** আশ্রম ট্রাস্টের ট্রাস্টী এবং ম্যানেজিং ট্রাস্টীপদে মনোনীত করা হইয়াছে। ঁনবকুমার চন্দ্র **মহাশয়ের পরলোক গমনে** শ্রীশ্রীমোহন **মন্দির** আশ্রম ট্রাস্টের ট্রাস্টী এবং ম্যানেজিং ট্রাস্টীপদের শূন্যস্থান পূরণ করা হইল।

**শ্রীসুরজিৎ দে (ট্রাস্টী)** **জয়তী দত্ত (ট্রাস্টী)**
**শ্রীপার্থসারথী চন্দ্র (ট্রাস্টী)** **ডাঃ সঞ্জয় চ্যাটার্জী (ট্রাস্টী)**
**শ্রীমতী রমা দত্ত (ট্রাস্টী)**

৪) বিগত ০৫/০২/২০২৬ তারিখে শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ট্রাস্টের বিশেষ জরুরী সভাতে (meeting) শ্রীমৎ পবিত্রানন্দ **ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীমোহনানন্দ** ট্রাস্টের ট্রাস্টীপদে মনোনীত করা হইয়াছে। ঁনবকুমার চন্দ্র মহাশয়ের পরলোক গমনে **শ্রীশ্রীমোহনানন্দ** ট্রাস্টের ট্রাস্টী পদের শূন্যস্থান পূরণ করা হইল।

**শ্রীসুরজিৎ দে (ম্যানেজিং ট্রাস্টী)** **শ্রীমতী রমা দত্ত (ট্রাস্টী)**
**জয়তী দত্ত (ট্রাস্টী)** **শ্রীত্রিলোক কুমার দত্ত (ট্রাস্টী)**

৫) বিগত ০৫/০২/২০২৬ তারিখে শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতির বিশেষ জরুরী সভাতে (meeting) শ্রীমৎ পবিত্রানন্দ ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতির প্রেসিডেন্ট ও গভর্নিং বডির সদস্য পদে মনোনীত করা হইয়াছে। শ্রীসম্বিদানন্দ ব্রহ্মচারীর পরলোক গমনে শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতির প্রেসিডেন্ট ও গভর্নিং বডির সদস্য পদের শূন্যস্থান পূরণ করা হইল।

**শ্রীসুরজিৎ দে** (সেক্রেটারী ও গভর্নিং বডির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ)

# যুবকদের প্রতি
## স্বামী সুপর্ণানন্দ, সেক্রেটারী রামকৃষ্ণমিশন (গোলপার্ক)

**প্রথমত:** যুবকদের কয়েকটি বিষয়ে আগ্রহী হতে হবে, সচেতন হতে হবে। দেহ একটি মন্দির, এর ভিতর ভগবান বাস করেছেন। তিনি আমাদের ভিতরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাই তাঁর আর এক নাম অন্তর্যামী এই বোধ হলে 'দেহকে অবহেলা করা চলে না। দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার সেইজন্য, জামা-কাপড়, ঘর-দোর সবকিছুই সুন্দর থাকবে, গোছানো থাকবে। থাকার পরিবেশ ভগবদ্-চিন্তার অনুকূল করে তুলতে হবে। আরও বুঝতে হবে— যারা ভোগজীবনে বিশ্বাসী তারাও 'দেহ' কে সুস্থ রাখার চেষ্টা করে। তাদের সঙ্গে যুবকদের কোথায় চিন্তার জগতে পার্থক্য তা ধরতে হবে। দেহকে ভোগের জন্য ব্যবহার করে মলিন করলে সে দেহ দিয়ে কোন মহৎ কাজ হবে না। দেহের বাইরে যাবার জন্যই দেহকে যত্ন করে যেতে হবে।

**দ্বিতীয়ত:** তাদের বুঝতে হবে যে, দেহকে চালায় 'মন'। 'মন' যা চায়— তা দেহকে দিয়েই করিয়ে নেওয়া হয়। 'মন' চাইলো এই জিনিসটা খাবো, পাবো, পরবো, অমনি দেহকে চালিত করে, উদ্যম নিয়ে বের হলাম। মন যদি শুদ্ধ হয়— দেহকে পবিত্র রাখা সহজ হয়। মনের করুণা না পেলে শুধু দেহ নয়, আমরা সর্বপ্রকারেই ছারখার হয়ে যাই। সুতরাং যুবকদের 'মন'কে শুদ্ধ রাখতে হবে। 'মন'কে শুদ্ধ রাখার অর্থ মনের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ করা। তুমি যে ঠিক পথে আছ তা প্রথমে তোমাকেই বিশ্বাস করতে হবে। তবে অনেক সময় তোমার 'মন' তোমাকে প্রতারণা করে। সেজন্য গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নাও— তোমার পথটি ঠিক কি না। তোমার সিদ্ধান্তে কোন ভুল আছে কি না। সেজন্য তোমাকে ধ্যানে বসতে হবে, নির্জনে সময় সময় একলা থাকা অভ্যাস কর। আর চিন্তা কর 'মন কী চায়'। মনের নিয়ন্ত্রণ ধ্যানের বা প্রাণায়ামের দ্বারা হয়। সুখাসনে বসে দু'নাক দিয়ে গভীর অথচ ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নাও। আবার ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কর, এইভাবে তিনবার কর, তারপর normal শ্বাস নাও— আর তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য কর— Observe your breathing —অন্য কোন চিন্তা এলে আবার গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ব্যাপারটি Repeat কর। এভাবে ১০/১২ মিনিট শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে দেখবে ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ঘুম পেলেই বুঝবে যে মন শান্ত হবার পথে। অপূর্ব শান্তি পাচ্ছে। ক্লান্তি সব চলে গেছে। ভরা পেটে এই প্রাণায়াম করো না। যদি পদ্মাসনে বসে করতে পার তো খুব ভালো হয়। তারপর প্রণাম করে, প্রার্থনা করে ধীরে ধীরে উঠে পড়বে বা যারা দীক্ষা নিয়েছে তারা জপ প্রভৃতি করবে।

ইচ্ছাশক্তির বিকাশেই যথার্থ মনের নিয়ন্ত্রণ বোঝা যায়।

তৃতীয়ত: তোমাদের বুঝতে হবে— মনের চেয়েও সূক্ষ্ম বস্তু আছে— তা হল বুদ্ধি। বুদ্ধি 'মন' কে চালায়। মন একটা সংকল্প করে। আবার তার বিকল্পও করে। স্থিরতা নেই তার। এই স্থিরতা, নিশ্চয়তা আনে বুদ্ধি। তুমি পড়তে বসবে না বেড়াতে যাবে— এইসব ভাবছ। বুদ্ধির সহায়ে তুমি ঠিক করলে বেড়াতে যাবে। আর তখনই পোশাক পরে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নিয়ে— ঘরের

বাইরে বের হলে। এসব বুদ্ধি করে। সুতরাং শানিত বুদ্ধি না হলে মনের সাহায্য নিয়ে বেশী দূর যেতে পারবে না। বুদ্ধিকে সঙ্গে রাখ।

চতুর্থত: এই বুদ্ধিরও পরে আছেন আত্মা— তাঁরই নির্দেশে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সব কাজ করছে। তিনিই দেবতা— আমাদের ভিতরে। তিনি আছেন বলেই আমরা ভালো হবার জন্য চেষ্টা করি। সুতরাং কেন ভালো হব, কেন ইন্দ্রিয় সব কাজ করছে। তিনিই দেবতা— আমাদের ভিতরে তিনি আছেন বলেই আমরা ভালো হবার জন্য চেষ্টা করি। সুতরাং কেন ভালো হব, কেন মনকে কন্ট্রোল করবো— কেন বুদ্ধিকে নিয়ে চলতে হবে— এর উত্তর কিন্তু খুব সহজ। আত্মার জন্য, আত্মার প্রকাশের জন্য ভগবানের আবির্ভাব আমাদের জীবনে ঘটবে। সেই জন্য আমরা মূলত দেবতাই। দেহ-মন-বুদ্ধি তাঁরই প্রভায়, তাঁরই শক্তিতে আলোকিত এবং চালিত। এটি মোক্ষম কথা। ধরবার চেষ্টা কর। এই হল বেদান্ত।

পঞ্চমত: আমরা যখন জেগে থাকি তখন দেহকেই সত্য বলে জানি। যখন গভীর ঘুমে থাকি তখন বাইরের বা দেহের কোনকিছুই জানি না। তখন আমরা আত্মাতে অবস্থান করি। আর যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন দেহ থেকে মনকে আলাদা করে (কারণ দেহ তোমার ঘরের খাটে পড়ে আছে অথচ মন দিল্লী আগ্রার রাজপথে, হোটেলে ঘুরছে) ফেলি। সুতরাং তোমরা বোঝ—

১) দেহ সত্য যখন জেগে আছ।

২) মন সত্য যখন স্বপ্ন দেখ।

৩) আত্মা সত্য যখন গভীর ঘুমে মগ্ন।

বোঝ ভালো করে—

১। গভীর ঘুমে আত্মা আছেন; মন, দেহ নেই।

২। স্বপ্নে আত্মা আছেন; মনও আছে। কিন্তু দেহ নেই।

৩। জাগ্রতে আত্মা আছেন; মন ও দেহ সবই আছে।

সুতরাং তিন অবস্থার মধ্যে একমাত্র আত্মাই সব সময় উপস্থিত এবং সেজন্যই আত্মাই আমাদের মধ্যে প্রকৃত সত্য বস্তু। দেহ বা মন বা বুদ্ধি সবই অনাত্মা। তারা তিনকালে (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি) নেই। হয় এককালে, নয় দুইকালে আছে। আত্মা— আমাদের আপনজন, সব সত্তাকে জুড়ে আছেন।

কখনও আমাদের ত্যাগ করেন না।

ষষ্ঠত: এই আত্মাকে অস্বীকার করলেই আত্মা মরে যান না। তিনি তোমার অন্তর জুড়ে আছেন। তাঁকে অস্বীকার করছ—মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে। মন বা বুদ্ধির কী ক্ষমতা— আত্মাকে অস্বীকার করে? মোহগ্রস্ত না হলে কেউ আত্মাকে অস্বীকার করতে পারে না।

সপ্তমত: এরপর থেকে তোমরা একদম ভাববে না যে, তোমাদের মন নেই, বুদ্ধি নেই, আত্মা নেই আর কেবলমাত্র দেহ নিয়েই জন্মেছ। আবার বলছি জাগ্রতে দেহ, স্বপ্নে মন। কিন্তু একমাত্র গভীর ঘুমেই যখন স্বপ্নও দেখ না (কারণ, ঘুমে মন থাকে না বলেই কোন কিছুর অনুভব হয় না) তখনই আত্মাকে পাও। তাঁকে পেলেই গভীর শান্তি— সব শ্রান্তি দূর হয়। Fresh হও। নিদ্রারূপিণী মাকে পাও। নিদ্রায় মায়ের কোলে থাক তাই নিদ্রা ক্লান্তিহরা। শেষে বলি, দেহের পরিচর্যা কর— খাবার খেয়ে। মন বুদ্ধিরও তেমনি পরিচর্যা করবে— ধ্যান প্রাণায়ামের ভিতর দিয়ে।

ooo

# অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী (পরবর্তী অংশ)

## শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর

তখনও গড়ে ওঠেনি আপার লাস্যুমিয়রের 'মোহনানন্দ' আবাস অবনীমোহনেরা থাকেন নানা সরকারী বাসভবনে- কখনো ধানক্ষেতির 'এলডোরাডো' এলাকায়, কখনো বা ওয়ারডস লেকের কাছাকাছি সুন্দর একটি বাড়িতে, যেখানে পর পর দুই দৌহিত্রের জন্ম হলো পঞ্চাশের একেবারে গোড়ার দিকে। তার কিছুদিন পরেই তৈরি হলো গুরুদেব আর নিজের বাবা-মায়ের নাম মিলিয়ে আগাগোড়াই কাঠের বাসভবন 'মোহনানন্দ'।

সমস্ত সময়েই মোহনানন্দজীর পরম আশ্রয়ে 'দাম' পরিবার। অবনী মোহনের দুই নাতিকে নিজ হাতে মধুও খাইয়েছেন এবং মনোমত তাদের নামও রেখেছিলেন মহারাজজী। 'মোহনানন্দ' বাড়ির তালা খুলে বাসভবনটির উদ্ঘাটন করেছিলেন তিনিই —পাশে দাঁড়িয়ে অবনী মোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয়।

সময় গড়ে তোলে কিছু প্রকরণ, কিছু আয়োজন, কিছু অভ্যেস; আবার একদিন এই সময়ই সে সব নিয়ে চলে যায়। যেন ঠিক নদীর চর; তৈরি হয়, ভেঙে যায়। পিছনের দিকে তাকালে এমনটাই মনে হয়।

মহারাজজী প্রথম এসে রইলেন অবনী মোহনের এলডোরাডো এলাকার কোয়ার্টারে। শীতের আগমনী নভেম্বরে। সে কী উৎসাহ সারা বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু আর ভক্তজনের মধ্যে। চলল একমাস ধরে উৎসবের আবহাওয়া। সকাল-বিকাল ভক্তসমাগম, সৎসঙ্গ আর তাতে হাজির মহারাজজীর শিষ্য-শিষ্যা ছাড়াও বহু মানুষজন। তারপর সন্ধ্যায় শুরু হত সংকীর্তন। চম্বুক যেমন অন্য ধাতুকে টেনে আনে— ভক্তির এই পরিমণ্ডল তেমনি টেনে আনলো কতোনা ব্যক্তিত্বকে! এলেন সুপ্তিদি, তাঁর স্বামী যামিনীরঞ্জন; দুজনের নামের মিল নিয়ে অনেক রঙ্গরস সবার। সুপ্তিদি দারুণ গান করেন, আর বিভিন্ন ধরণের গান। এলেন অমিয়াদি বা ঘুঘুমাসী।

মহারাজজীর কীর্তনের আগে আসর জমিয়ে রাখতেন এঁরা এবং আরও অনেকে। কীর্তনে সবাই দোহার দিতেন। ব্যবস্থা-পনায় লাবানের একটি বড় দল, এঁদের নেত্রী ছিলেন অনিমাদি। আর এসব কিছুর উপরে বাতাস বা রোদ্দুরের মতোই যেন ছড়িয়ে সবকিছু সামলাচ্ছেন; পরম আত্মীয়া, নিউ কলোনী নিবাসী সন্ধ্যা নন্দী—সবার নেনীদি। একা লতিকা কতোদিক সামলাবেন; নেনীদিতো 'একাই একশ'— নির্ভরতার প্রতিমূর্তি। ভক্তমণ্ডলীর উৎসাহ আর দাম পরিবারের তত্ত্বাবধানে সম্ভব হয়েছিল পর পর তিন বছর বাড়িতে সরস্বতী পুজো করা। পুজো করতেন স্বয়ং মহারাজজী; সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা স্মৃতির মহা সম্পদ।

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান হতো অন্ততঃ দু ঘণ্টাব্যাপী। একটি মঞ্চের উপরে মহারাজ, পাশে থাকা ছোট্ট একটি টেবিলের ওপর কৃষ্ণঠাকুর আর পরমগুরুমহারাজজী বালানন্দজীর মাল্য শোভিত ছবি রাখা থাকত। কখনও কখনও সৎপ্রসঙ্গের অবতারণা করতেন মহারাজ-তারপর হত রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে। হতো হরির লুঠ। মহারাজজী সবার মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিতেন বাতাসা, নকুলদানা, লাড্ডু,

সন্দেশ। সেইসকল কুড়িয়ে জড়ো করাটা যেন একটা খেলা ছিল সমবেত ভক্তদের। তবে তারও আগে ঠাকুরদের প্রসাদ ফুল নিবেদন করতেন মহারাজজী, মনে হতো যেন তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন ওনাদের হাত থেকে কখনও খসে পড়ত অর্ঘ্য। তারপর রাধে রাধে। ধূপ-ধুনোর সুবাস, মহারাজজীর পুণ্য উপস্থিতি, ভক্তদের অনাবিল আবেগ, সবমিলে বৈকুণ্ঠ নেমে আসত ধরাধামে।

মহারাজজীর নিবিড় সঙ্গ, সাহচর্য একটু একটু করে রং ধরালো মনে। অবনীমোহন বলতেন মহারাজজীর কীর্তন শুনতে শুনতে বুকের ভিতরে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো কিছু অনুভব করতেন। বুকের মানব জমিনে বদল ঘটতে থাকে বোধহয় সেইসমস্ত অনন্য মুহূর্তে। ....কেমন ছিল নিজস্ব সেই বাসভবন যেখানে মহারাজজীকে অধিষ্ঠিত করতে পেরে ধন্য হলেন সপরিবারে অবনীমোহন? ভবনটি জন্ম মুহূর্ত থেকে আশীর্বাদ পেয়েছে এই মহাপুরুষের। আপার লাস্যুমিয়রের এই বাড়িটির উজ্জ্বল বাদামী রং-এর কাঠ সূর্য্যের আলোয় আলোকিত। পুবের আলো পড়ে বাড়ির সামনেটায় আর অস্তগামী পশ্চিমের মৃদু রোদ্দুর যেন আদর করে চলে যায় বাড়ির পেছন দিককার সিঁড়িগুলোকে। বাড়িতে ঢুকবার দুটো রাস্তা: হপকিনসন রোডের দিক থেকে উঠে এলে ডানদিকে দু'তিন ধাপ সিঁড়ি উঠলেই একটি প্রবেশদ্বার। আপার লাস্যুমিয়রের শুরুর দিকে ছিল ফটক, আর গাড়ির রাস্তা। সেই রাস্তার দুপাশে অনেকটা দূর্বা ঘাসের লন, তারপর ফুল, ফল আর সবজির বাগান। বাড়ির ছোট মেয়েটির বয়স তখন বছর চার। অন্য মেয়েদের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম সর্বাণী। ওর ভালো লাগে প্লাম আর কমলালেবু। আর ভালো লাগে লন ম্যোয়ার দিয়ে ছেঁটে স্তুপ করে রাখা ঘাসের বালিশ বানিয়ে ফুলের বাগানে শুয়ে থাকতে।

চারিদিকে ফুটে থাকে গোলাপ, জিনিয়া, ডালিয়া, পপি। ফুলেরা কী যেন সব কথা বলে ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে। সন্ধ্যার তারারা ফুটে উঠলেই হয় ঘরে ঢোকার সময়। বিকেলের খাবার কী হচ্ছে দেখার জন্য হয়তো উঁকি দিল রান্নাঘর আর প্যান্ট্রির দিকে। সেখানে ব্যস্ত পাচক আর পরিচারিকেরা। টিনঢাকা প্যান্ট্রী শেষ হতেই মূল বাড়িতে প্রবেশের পথ। সন্ধ্যার আঁধারে একটু ভয় লাগে সর্ব্বানীর বড় বাড়িটার আঠারোটার মত ঘরে ঘুরতে-ফিরতে। একেবারে কোণের ঘরটা ছোটদির পড়ার ঘর। এই দিদিই কেবল এখন বাড়িতে অন্য দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দুই দাদা পড়াশুনা করতে গেছে কোলকাতায় ছুটি-ছাটা পেলে আসতে পারে। আঁধার ঘনিয়ে আসতেই একছুট্টে চলে আসে মেয়েটি মায়ের ঘরে। পাশেই বাবার শোবার ঘর। চা খেয়ে বাবা একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন এখন।

মহারাজজী মাসখানেকের জন্য এলে তাঁরই চারপাশে ঘোরঘুরি করে মেয়েটি। মহারাজজী প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন, —কোলে তুলে নেন কখনো। তাঁর কাছেই হলো হাতেখড়ি। বড় হয়ে ওঠার বছরগুলোতে এভাবেই মিলেমিশে রইলো মহারাজজীর সঙ্গে। আর রইলো দেবগীতালির অত্যন্ত কাছের শনিবারগুলো। শরীর তেমন ভালো নয় মেয়েটির। শীতশুরুর এই সময়টাতে স্কুলের পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো জ্বরও থাকে। তবু 'মোহনানন্দ' বাড়ির ঐ দশ-বারো বছর তার স্মৃতির 'এলডোরাডো!' বাড়িটির এক একটি ঘরে তার সমস্ত শৈশব-কৈশোর যেন জমাট বেঁধে রইলো মহারাজজীর পুণ্য স্মৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে। স্মৃতির কোনো এক অজানা দরজা খুলে গেলেই যেন সেই উদার প্রশস্ত ঘরগুলোতে আবার ঢুকে পড়তে পারবে সর্ব্বণী।

স্মৃতির আকাশে নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করে কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

(ক্রমশঃ)

# শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরীমা
## ভক্তের অনুভবে — তৃতীয় পর্ব

### শ্রীসোমনাথ সরকার

পরদিন প্রভাতে শঙ্কর যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর নিকট লওয়াই নিয়ম কলিতে যেহেতু সন্ন্যাস নেই তাই তখন ঐস্থানে বৈদিক সন্ন্যাসীর অভাব। তাই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ শঙ্কর নিজেই আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজা হোম করে বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

ভক্তগণ এখন খেয়াল করে দেখুন ঠিক এই কারণেই আমাদের আশ্রমে শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজ প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব গুরুগণ সন্ন্যাস না নিয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন।

অষ্টমবর্ষীয় বালক শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করে গুরু অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। শঙ্করের পিছু পিছু আনন্দরত মাতা বিশিষ্টাদেবী ও গ্রামবাসীগণ গ্রামের সীমানা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

ভক্তগণ মনে করে দেখুন আমাদের বড়গুরুমহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজিও নবম বর্ষে উপনয়ণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর পরই দণ্ডীঘর থেকে বেরিয়ে নর্মদাতীর ধরে চলতে শুরু করলেন গুরু অন্বেষণে। শঙ্কর নর্মদাতীরস্থ মহাযোগী গুরুগোবিন্দপাদের কাছে যোগ শিক্ষার উদ্দেশ্যে চললেন।

বাল্যকালে গুরুগৃহে ব্যাকরণশাস্ত্র পাঠের সময় শঙ্কর যখন পতঞ্জলির মহাভাষা অধ্যয়ণ করেন, তখন গুরুর কাছে শুনেছিলেন স্বয়ং পতঞ্জলিদেব সহস্র বছর ধরে গুরু গোবিন্দপাদ নাম নিয়ে নর্মদা তীরে এক গুহার মধ্যে সমাধিস্থ আছেন। সেই থেকে শঙ্করের মনে ইচ্ছা জেগেছিল এনার কাছেই যোগদীক্ষা নেবার।

শঙ্করের গ্রাম কেরলের কালাডি থেকে নর্মদার দূরত্ব বেশ অনেকটাই। পদব্রজে প্রায় একমাসের ওপর সময় লাগে। শঙ্কর বিভিন্ন জনপদ, তীর্থ অতিক্রম করে চললেন গুরুগোবিন্দপাদের সন্ধানে। কয়েকদিন এইভাবে চলার পর তুঙ্গানদীর তীরে এক নির্জন অরণ্য মধ্যে পৌঁছে এক গাছের তলায় পথশ্রান্তি দূর করে মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করলেন। এমন সময় দেখলেন কতকগুলি ভেকশাবক জল থেকে তীরে উঠে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসল। তবে সূর্যের উত্তাপে প্রস্তরের উপরিভাগ উত্তপ্ত থাকায় তারা সেই উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে পুনরায় জলমধ্যে নিমজ্জিত হতে উদ্যত হ'লে; কোথা হ'তে একটি সর্প বিশালাকার ফনা বিস্তার করে তাদের ছায়াদান করল এবং একটি ভেকও ভক্ষণ করল না। উপরন্তু ভেকগুলো তার ফণার ছায়ায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। পরে পুণরায় ভেক শাবকগুলো জলমধ্যে প্রবেশ করার পর সর্পটিও সেখান থেকে চলে গেল।

এইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে শঙ্কর অবাক হয়ে গেলেন। যারা স্বভাবতঃই পরস্পরের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন,

তাদের এই অদ্ভুত আচরণে শঙ্কর ভাবলেন নিশ্চয়ই এখানকার কোনো স্থান মাহাত্ম্য আছে। সত্য অনুসন্ধান করবার জন্য শঙ্কর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটি গিরিশৃঙ্গ দেখতে পেলেন। নিকটে গিয়ে দেখলেন শৃঙ্গের উপর পর্যন্ত সোপান শ্রেণী চলে গিয়েছে। শঙ্কর কৌতুহলি হয়ে উপরে উঠতে লাগলেন এবং অবশেষে শৈলের উপরে পৌঁছে একটা পর্ণকুটীর দেখতে পেলেন। নিকটে গিয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধ তপস্বী একাকী তন্মধ্যে বসে রয়েছেন।

শঙ্কর তপস্বীকে প্রণাম করলেন, তপস্বী শঙ্করকে প্রত্যাভিবাদন করলেন। পরস্পর পরস্পরের পরিচয় জানলেন। তাপস বললেন, স্থানটি ঋষ্যশৃঙ্গমুনির আশ্রম। গুরুপরম্পরায় তাঁরা সেইস্থানে তপস্যা করে আসছেন। তপস্যা যদি করতেই হয় তবে এইরূপ শান্ত বৈরিভাবহীন দেশেই করা উচিত।

শঙ্করের এই ভাবনাই শঙ্করকে পরবর্তীকালে এই স্থানে শৃঙ্গেরী মঠ স্থাপনের প্রেরণা প্রদান করেছিল। এখানে একটা বিশেষ বিষয় উল্লেখ করবার আছে। একথা প্রায় সকলেরই অবগত যে রাজা দশরথের পুত্রলাভের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজাকে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করতে পরামর্শ দেন। রাজা দশরথ সেই উদ্দেশ্যে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যা নগরীতে আনয়ণ করেন এবং ঋষি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করেন; তার ফলে রামচন্দ্র সহ চারপুত্রের পিতা হন রাজা দশরথ।

প্রায় দু'মাস চলার পর শঙ্কর মহিষ্মতীর নিকটে এসে নর্মদার সন্ধান পেলেন। তবে কোথায় গেলে গোবিন্দ পাদ নামক পতঞ্জলীদেবের সন্ধান পাবেন তা জানে না। জিজ্ঞাসা করেও কারও কাছ থেকেই কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। এখানে মহিষ্মতী স্থানটির ব্যাপারে কিছু বলার একটু প্রয়োজন বোধ করি। মহিষ্মতীর বর্তমান নাম মহেশ্বর। এটা মধ্যপ্রদেশের নর্মদাতীরস্থ একটি নগর। রাণী অহল্যাবাঈ হোলকারের রাজধানী ছিল।

অনেককে জিজ্ঞেস করবার পর এক বৃদ্ধের কাছে জানতে পারলেন পূর্বদিকে ওঁকারনাথ নামক স্থানে এক বড় যোগী আছেন বলে তিনি শুনেছেন। তবে গোবিন্দপাদ তিনিই কিনা— সেটার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন। ওঁকারনাথের বর্তমান নাম ওঁকারেশ্বর নর্মদা তীরস্থ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম।

(ক্রমশঃ)

ooo

যে সব অবতারকল্প মহাপুরুষ তাঁর সহিত নির্বিকল্প সমাধিতে একীভূত হয়েছেন, তাঁরা জগতের কল্যাণের জন্য আবার যখন জগতের সঙ্গে ব্যবহারিক সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁরা যেখানেই যান সেখানেই তাঁর বার্তা বহন করে নিয়ে যান।"

# স্মৃতির পাতা থেকে

## শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়

বেশ কিছু বছর অতীতের ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাস, দুর্গাপুর আশ্রমে শ্রীগুরুর আবির্ভাব তিথির উৎসব হবে। তার মাত্র কয়েকমাস আগে আমার দীক্ষা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ না করলেই নয়— সেই সময় প্রায় বছরখানেক ধরে একজন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিখারি প্রতি বুধবারে আমাদের কোয়ার্টারের কুলগাছতলায় এসে বসত। আমি সাধ্যমত থালায় ভাত-তরকারি-জল তাকে খেতে দিতাম। সেও আমাকে অনেক আশীর্বাদ করে ফিরে যেত।

যে দিনের কথা লিখতে চলেছি, সেইদিনেই গুরুমহারাজজীর জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে আমাদের নডিহা আশ্রমে বিশেষ পূজন হোম-যজ্ঞ-আরতি-প্রদীপ-প্রজ্জ্বলন, কেক কাটা-নবান্ন ও শেষে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা রয়েছে বরাবরের মত।

সেইদিন আমি সকাল সকাল স্নান সেরে নিজের নিত্যপুজোপাঠ সবকিছু করে আশ্রমে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি প্রতিসপ্তাহের মত সেইদিনও ঐ ভিখারী ব্যক্তি তার থালা-গেলাস নিয়ে একটু সকাল সকাল এসে হাজির হয়েছে। আমাকে দেখে বলে উঠল তাকে খাবার দেওয়ার জন্য। আমার দেখে মনে হল ঠিকইতো, সেইদিনটা বুধবাররই ছিল, আসলে আমার আশ্রমে গিয়েও কিছু কাজের দায়িত্ব নেওয়ার ছিল। আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম আজ বিশেষ তাড়া আছে— এই টাকা কটা রাখো। ঐ পাশের দোকানে গিয়ে পছন্দমত কিছু কিনে খেয়ে নাও, কিন্তু সেই ব্যক্তি আমাকে বলল, 'না মাগো, আমাকে টাকা দিওনা, সামান্য কিছু খাবার দাও মা তাতেই হবে। দোকানীরা আমাদের থেকে টাকা নিতে চায়না, মাগো আর টাকাতো খাওয়া যায় না'; কী আর করা যাবে, শেষে আমি উপরে গিয়ে মুড়ি, কলা আর আমাদের ঘরে মহারাজজীকে নিবেদন করা একটু পায়েস এনে দিলাম। তাতে ওর পেট ভরবে না জানি, কী আর করা যাবে, আশ্রমে যাব বলে ঘরে তো সেদিন ভাত রান্না করিনি।

আশ্রমে পৌঁছে সকল পুজোপাঠ দর্শন সবকিছুই হল। যতদূর মনে পড়ছে সেই সময় নডিহা আশ্রমের সেক্রেটারী ছিলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অনিল বাসু রায়চৌধুরী, বর্তমানে তিনি শ্রীগুরুচরণে আশ্রয় পেয়েছেন। সেই সময়ের যাঁদের কথা মনে ভীড় করে আসে, যেমন শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গ রায়, শ্রীশচন্দ্র সাহা, দীলিপ চ্যাটার্জী, আবার সকলের প্রিয় মোরে দাদা আরও অনেকে কিন্তু তাঁরা কেউই আজ আর নেই। তবে স্মৃতিতো তার ডালি সাজিয়ে মনের দরজায় কড়া নাড়ে। আমার শ্বশুর মশাই শ্রীভৈরব মুখার্জী যদিও বা এখনও আছেন কিন্তু তিনি স্মৃতি হারিয়েছেন।

এখন আবার অনেক নতুনরাও সদস্য পদে এসেছেন। তবে আশ্রমতো আশ্রমই, আমাদের প্রিয় জায়গা সর্বকালের জন্য।

পুরনো কথায় আবার ফিরি। আমি যখন সেদিন আমার উপর ন্যস্ত আশ্রমের কাজগুলি সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরব ফিরব করছি এমন সময় ভাণ্ডারার দায়িত্বে থাকা ব্যানার্জী কাকু আমাকে ডেকে বললেন, 'আজকে সাহাবাবুর বাড়ি থেকে কেউ আসেননি কেন জানিনা, এই প্যাকেটে দেবীমা-মহারাজের কিছু প্রসাদ দিলাম, তোরা বাড়ি ফেরার পথে ওদের বাড়িতে এটা দিয়ে যাস।' তখন ফোনের এত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলনা। আমি ঐ প্যাকেট নিয়ে সাহাকাকুর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, ওরা কেউ নেই বাড়িতে দু-তিনটে তালা ঝুলছে; বুঝলাম ওরা দূরে কোথাও গেছে। শীঘ্র ফেরবার কোনও আশা নেই দেখে ঐ দিকে এসে দেখি, দুপুরের হাল্কা রোদে ঐ ভিখারি অতিথি তার বড় ঝোলাটা মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐ প্রসাদের প্যাকেটটি আমি তার বাটির কাছে নামিয়ে রাখতেই, সে ঘুম ভেঙে উঠে বলল 'মা-তুমি এসে গেছ?' আমি বললাম এই প্যাকেটে ভোগ প্রসাদ আছে, তুমি খেয়ে নাও। সে বলল, 'জানতাম প্রসাদ পাব, এই প্রসাদের কথা মনে মনে ভেবেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একজন সুদর্শন পুরুষ আমাকে কানে কানে বলে গেলেন, তোমার প্রসাদ এসে গেছে।' আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম; প্রথমতঃ বুধবার ভুলে গিয়েছিলাম বলে নিজের মনে আফশোস হচ্ছিল, আমি এত অপূর্ব ভাণ্ডারা খেলাম আর ঐ ভিখারিটি একটু অন্ন পেলনা; এই কথা ভেবে। এখন দিতে পেরে নিজের আবেগেই প্রণাম জানাতে লাগলাম, নিজ শিষ্যার ভুলের প্রায়শ্চিত্তও তিনি করিয়ে দিলেন; এত দয়াময় তুমি আমার দয়াল গুরু। বারবার তোমার কাছে মিনতি জানাই প্রভু তুমি আমাদের সবার মঙ্গল করো—মন্ত্র দাতা তুমি মুক্তি দাতা...

ooo

"যে দেশে ভগবানের নাম হয়, সে দেশ পবিত্র। যাঁরা ভগবানের নামরসে সর্বদা নিজেদের সিক্ত রাখেন, সে সব মহাপুরুষের গায়ের বাতাসে আমাদের দেহেও ভাগবতী শক্তির বিকাশ হয়। যে সাধু নিত্য নামকীর্তন করেন, তাঁর গায়ের বাতাসও শুভ্র জলকণার ন্যায় সকলকে স্নিগ্ধ, শান্ত ও পবিত্র করে।"

**—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ**

# 'নাম নামী অভেদরে'

## শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

আজ বড় গুরুমহারাজজীর গল্পের ছলে বলা অন্যতম একটি উপদেশ এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

এক মহাপুরুষ অনেকদিন ধরে তপস্যা করছিলেন, অথচ তাঁর কিছুতেই ঈশ্বর দর্শন হচ্ছিল না। অবশেষে একদিন তিনি দৈববাণী শুনলেন যে নিজের সাধনায় ওনার ভগবদ্ দর্শন হবে না। একাগ্রশক্তি বাম থাকায় ওনার সাধনায় একটি ত্রুটি থেকে যাচ্ছে এই জন্য এমন এক উত্তরসাধক খুঁজতে হবে, যে সদাই একাগ্রচিত্ত আর তাঁরই সাধনার ফলে এনারও ঈশ্বর দর্শন হবে। এই আদেশ শুনে সেই সাধু তপস্যা ছেড়ে দিয়ে উত্তরসাধকের সন্ধানে বেরোলেন; একদিন কোনও এক নদীর পাড় দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন একটি বালক একমনে ছিপ দিয়ে মাঝ ধরছে—তার আর কোনও দিকে মন নেই। সাধু ওর পেছনে দাঁড়িয়ে বালকটির মনের একগ্রতা লক্ষ্য করতে লাগলেন। ঐ সময় ওখানে এক বরযাত্রীর দল জোরে জোরে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল, ছেলেটি কিন্তু একবারের জন্যও ঐ দলের দিকে ফিরে তাকাল না। এত শব্দেও তার একগ্রতা বন্ধ হোলনা। সাধু দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পর ছিপে যেই মাছ উঠলো অমনি সে মাছটিকে তুলে ধরে রেখে পেছন ফিরে তাকাল। তখন সাধুকে দেখতে পেয়ে সে প্রণাম করল। সাধু বললেন, কই তুমিতো আগে আমাকে প্রণাম করলে না"। ছেলেটি উত্তর দিল, মহারাজ, 'আমিতো আপনাকে আগে দেখিইনি, প্রণাম কী করে করবো"। সাধু তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কিছুক্ষণ আগে খুব ধুমধাম করে বাজনা বাজিয়ে একদল বরযাত্রী এখান দিয়েই যাচ্ছিল, তুমি কী ওদের দেখেছো বা কোনও বাজনার আওয়াজ পেয়েছো?" ছেলেটি উত্তর করল, 'না আমি বরযাত্রীদের দেখেছি, না কোনও বাজনা শুনেছি— আমার মন মাছ ধরার ছিপেই আটকে ছিল।' ওর কথা শুনে সাধু অবাক হয়ে মনে মনে নিজেকে বলল, বাঃ এই ছেলেটিতো খুব একাগ্রশক্তি সম্পন্ন আমিতো এরকম ছেলেই খুঁজে বেড়াচ্ছি একে যদি আমার উত্তর সাধক বানাতে পারি তাহলে আমার কার্য সিদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হবে। সাধু বালকটিকে প্রশ্ন করলেন, 'বাছা তুমি রোজ মাছ বেচে কত পয়সা পাও? ছেলেটি উত্তর দিল, 'বাবা আমি রোজ চার আনা পয়সা পাই; সাধু তাকে বললেন, 'কাল থেকে তোমাকে আর মাছের কারবার করতে হবেনা, আমি তোমাকে রোজ একটাকা, করে দেব তুমি আমার হয়ে কাজ করো'।

আমার একটি বাচ্চা ছেলে ছিল, ও হারিয়ে গেছে। তুমি ঐ বাচ্চাটিকে খুঁজে বার করো। ছেলেটি রাজী হয়ে বলল, "ঠিক আছে আমি আর মাছের কারবার করব না, কিন্তু আপনি আমাকে বলুন আপনার ছেলে দেখতে কেমন আর কীভাবেই বা ওর খোঁজ পাওয়া যাবে,' সাধু উত্তর করলেন আমার ছেলের গায়ের রং নবীন মেঘের মতো, চুল কোঁকড়ানো, মাথায় শিখিপাখা, হাতে বাঁশি ও পায়ে নূপুর। বিদ্যুতের মতো ওর শরীরের জ্যোতি, ওর নাম গোপাল, খুব দুষ্টু আর চঞ্চল— এই বনেই ঢুকে আছে। তুমি এখানেই ওর খোঁজ করো। গোপাল গোপাল বলে ডাকো, নিশ্চয়ই ওকে পেয়ে যাবে। ও সহজে

ধরা দেয়না, গভীর জঙ্গলে, গিয়ে ওর নাম ধরে বার বার ডাকতে থাকবে, তবেই ঐ বালক তোমার কাছে আসবে কিন্তু ঝট্ করে ওকে ধরতে পারবে না। যখন ওর বাঁশির শব্দ শুনতে পাবে, নূপুরের আওয়াজ কানে আসবে তখন বুঝবে ও তোমার কাছাকাছি এসে গেছে। এর মাধ্যমে গুরু শিষ্যকে নাদানুসন্ধান বুঝিয়ে দিলেন, এটা এক রকম 'হাতে কাম মুখে নাম'; অর্থাৎ হাতে কাজ করলেও মনে মনে সর্বদাই ইষ্টনাম জপে যেতে হবে, তবেই একসময় ইষ্টদেব মনোময় হয়ে তোমার কাছে থাকবেন। সাধু এভাবে বালকটিকে অনেক করে বুঝিয়ে দিলে সে বলল, 'বাবা, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, আমি জঙ্গলে গিয়ে ঝট করে আপনার পুত্রকে খুঁজে নিয়ে আসছি।'

ঘন জঙ্গলে গিয়ে ছেলেটিকে তো আবার একাগ্রচিত্তে গোপাল গোপাল বলে ডাকতে লাগল ও সহজেই গোপালের বংশীধ্বনি শুনতে পেল। তক্ষনি আনন্দে অধীর হয়ে সে সাধুর কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা, আমি আপনার ছেলের বাঁশী ও নূপুরের আওয়াজ শুনেছি কিন্তু ওকে দেখতে পাইনি।' সাধু ওকে আরও উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'বালক বড় চঞ্চল ও সহজে ধরা দেবেনা, তবে দূর থেকে ওর রূপ দর্শন করতে পারবে। শ্যামবর্ণ, পীত বসনধারী, গলায় বনমালা, উজ্জ্বল কান্তি; সে তোমার সামনে ঘুরে বেড়াবে ও বিদ্যুতের মত এদিক ওদিক চমকাবে; তুমি সেই জ্যোতি দেখে ওর নাম ধরে ডাক'। এর মাধ্যমে গুরু শিষ্যকে নামের সঙ্গে বিন্দু বা নামীর সন্ধান দিয়ে দিলেন। সাধুর কথামত ছেলেটি ঘন জঙ্গলে গিয়ে আকুলভাবে গোপাল গোপাল গোপাল বলে ডাকতে লাগল এইরকমভাবে নাম জপ করতে করতে ছেলেটির চিত্ত একদম সিদ্ধ হয়ে গেল এবং বিন্দুর সন্ধান পেয়ে গেল অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন হোল। বালকটি আনন্দে অধীর হয়ে সাধুর কাছে এসে বলল, "বাবা আপনার সামনে এসে আবার দূরে দূরে গোপাল ছোটাছুটি করে কিন্তু কাছে আসেনা—আমি কী করে ওকে ধরবো?" সাধু তখন বালকটিকে আরও উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'এবার ও নিজে থেকেই তোমার কাছে ধরা দেবে। তুমি একমনে ওর নাম ধরে ডাকো'। বালক প্রাণপনে ডাকতে লাগল। ডাকতে ডাকতে ও ভাবে তন্ময় হয়ে গেল, আর ওর সামনে ধরা দিল নবীন মেঘের মত উজ্জ্বলকান্তি গোপাল। এভাবেই বালকের ভগবদ্‌দর্শন হয়ে গেল। তখন সে সাধুর কাছে গিয়ে বলল, "হে গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমার আজ গোপাল দর্শন হল। সাধু তাকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন, "এতদিন আমি তোমার গুরুছিলাম, আজ থেকে আমি তোমার শিষ্য, তুমি আমার গুরু। কীভাবে গোপালের দর্শন পেলে তা তুমি আমায় জানাও।" বালক সাধুকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল ও যেভাবে নাম জপ করছিল, তা সাধুকে দেখিয়ে দিল। সাধুর উপরতো আদেশ ছিলই উত্তর সাধকের দ্বারা ওর সিদ্ধি লাভ হবে। সাধু এবার বালকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করল এবং ওর দেখানো পথেই গোপালকে ডাকতে লাগল এবং এর ফলে সাধু অতি সহজেই উত্তর সাধকের দেখানো পথে গোপালের দর্শন লাভ করলেন। দুই সিদ্ধ সাধকই এইভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম লাভ করে ধন্য হয়ে গেল। এই গল্প থেকেই বোঝা যাচ্ছে নাম ও নামী অভেদ। নাম নিয়ে যখন আকুলভাবে ডাকবে, তখন নামীকেও পেয়ে যাবে। কলিতে বলাই হয়েছে 'জপাৎ সিদ্ধি',

বড় মহারাজজী আরও বলেছেন, 'তদ্ জপং তদর্থভাবনম্'। অর্থাৎ জপ করো আর মনে মনে তার অর্থ ভাব। নাম জপ করো আর মনে মনে যার জপ করছ, তাঁরই রূপ কল্পনা করো। ভাবতে ভাবতেই ভাবোন্মাদ হয়ে যাবে আর সাক্ষাৎ ভগবদ্ দর্শন হবে।

# দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

| ২০২৬ সাল | ১৪৩৩ সন | উপলক্ষ্য |
|---|---|---|
| ১৫ই এপ্রিল | ১লা বৈশাখ বুধবার | বাংলা নববর্ষ উৎসব কলকাতার সল্টলেকস্থিত শ্রীশ্রীমোহনানন্দ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইবে। |
| ১৫ই জুন | ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার | দেওঘর ও সকল আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা। |
| ১৬ই জুলাই | ৩১শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার | দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠান পালিত হইবে। |
| ২৪শে জুলাই | ৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার | শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুর্নযাত্রা (উল্টোরথ) অনুষ্ঠিত হইবে। |
| ২৯শে জুলাই | ১২ই শ্রাবণ, বুধবার | দেওঘর আশ্রমসহ সকল তীর্থাশ্রমে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা। |
| ৩০শে আগস্ট | ১১ই ভাদ্র, রবিবার | দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং তপোবন আশ্রমে শ্রীশ্রীনর্মদামাতার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও ভাণ্ডারা। অন্যসকল আশ্রমেও তিরোধান তিথি পালিত হইবে। |
| ২৪শে সেপ্টেম্বর -২৬ শে সেপ্টেম্বর | ৬ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার -৮ই আশ্বিন, শনিবার | হরিদ্বার আশ্রমে শ্রীশ্রীপরম গুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তিন দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা। |
| ১১ই অক্টোবর | ২৩শে আশ্বিন, রবিবার | দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ ঘটস্থাপন ও নবরাত্রি ব্রতারম্ভ। |
| ১৬ই অক্টোবর | ২৮শে আশ্বিন, শুক্রবার | মহাষষ্ঠী, শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর ষষ্ঠীবিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। |
| ১৭ই অক্টোবর | ২৯শে আশ্বিন, শনিবার | শ্রীশ্রীদুর্গামহাসপ্তমী। পূর্বাহ্ন ৯।২৮ মধ্যে দ্ব্যাত্মকচরলগ্নে ও চরণাবংশে (কিন্তু, কালবেলানুরোধে দিবা ৭।৪ গতে পূর্বাহ্ন |

| ২০২৫ সাল | ১৪৩২ সন | উপলক্ষ্য |
|---|---|---|
| | | মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, ও সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্তা। |
| ১৮ই অক্টোবর | ৩০শে আশ্বিন, রবিবার | প্রাতঃ ৫।৫৩ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লা সপ্তমীবিহিত অধিক পূজা প্রশস্তা। |
| ১৯শে অক্টোবর | ১লা কার্তিক, সোমবার<br>৫.৩৯ | শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গদেবীর মহাষ্টমীবিহিত পূজা প্রশস্তা।<br>**সন্ধিপূজা:** দিবা: ৭/২৬ গতে সন্ধিপূজারম্ভ।<br>দিবা: ৭/৫০ গতে বলিদান।<br>দিবা: ৮/১৪ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন। |
| ২০শে অক্টোবর | ২রা কার্তিক, মঙ্গলবার | দিবা ৫.৪০ গতে<br>শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহানবমীবিহিত পূজা প্রশস্তা, সপ্তসতীর (চণ্ডী) হোম ও পূর্ণাহুতি এবং নবরাত্রি ব্রত সমাপন। |
| ২১শে অক্টোবর | ৩রা কার্তিক, বুধবার | দশমী। শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন প্রশস্তা। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। বিজয়াদশমী কৃত্য। দুর্গাপুর আশ্রমেও এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। |
| ২৫শে অক্টোবর | ৭ই কার্তিক, রবিবার | শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা দেওঘর আশ্রমে ও পুরীতীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইবে। |

"ভোগ-পরাঙমুখ চিত্ত যখন সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শান্তিকেই বরণ করিয়া লয়েন, তখনই তাঁদের অন্তরে মোক্ষের প্রতি তীব্র অদম্য ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠা দেখা দেয়।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

# পুণ্য-পরশ-পুলক (২২শ পর্ব)

## শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

ছোটবেলায় ঘুমানোর সময় মায়ের কাছে গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম জানি না। গল্পগুলো ছিল রকমারি বিষয়ের। কখনও রূপকথা, ঈশপের গল্প, রামায়ণ, মহাভারতের, কখনো শিক্ষা মূলক গল্প এই সব। একরাত্রে বলেছিলেন বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্বাসা মুনির আহার প্রার্থনা করার গল্প। তখন তাঁদের নিজেদের খাবারই ঠিক মতো জোটে না, এমন সময় দুর্বাসা মুনি বলে গেলেন, 'স্নান করে এসে আজ তোমার এখানে দুপুরের খাওয়া খাব।' যুধিষ্ঠিরের কাছে এই কথা শুনে তো দ্রৌপদীর মাথায় হাত। ঘরে একটা খুদকুড়োও নেই যে তক্ষুণি কিছু রেঁধে দিতে পারেন। কী করেন, কী করেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ এসে বললেন, 'কৃষ্ণা আমায় কিছু খেতে দিতে পারো?' দ্রৌপদী তো লজ্জায় মরেন। তাঁর নিজের আহারও সারা হয়ে গেছে। হাঁড়ি কড়া সব নামিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন রান্নাঘরে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি তুলে দেখলেন সেখানে এক দানা ভাত আর এক কুচি শাক লেগে আছে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাতের কণা আর শাকের কুচি তুলে নিয়ে মুখে ফেলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললেন, 'আঃ'। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজনের পেট ভরে গেল। দুর্বাসাও সশিষ্য স্নান সেরে ফিরে গেলেন গন্তব্যে। ছোটবেলায় এই সব গল্প বড় আজগুবি বলেই মনে হতো। প্রশ্নও করতাম। কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পেতাম না।

সেবার জন্মতিথি উৎসবে আঠারোবাড়ি হাউসে ভিড়ের শেষ নেই। লম্বা লাইন এঁকে বেঁকে চলেছে বাঁশের তৈরি গলি দিয়ে। সকাল নটা নাগাদ প্রণামের লাইনে দাঁড়িয়েছি, তাতেও দুটো আঁড়াইটের আগে কিছুতেই হবে না। লাইনে দাঁড়িয়ে কখনও নিজেদের মধ্যে মশকরা করছি, কখনও ব্যাগ থেকে বার করে গল্পের বই পড়ছি, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সতীর্থের কাছ থেকে খবরের কাগজ নিয়ে পড়ছি। সে সময় আমাদের কলেজ জীবন শুরু হয়েছে। কাজেই লুকিয়ে মেয়েদের দেখার প্রবণতা এসেছে। সেই মতো সুন্দর মতো কোনও মুখ নজরে এলে এ ওকে দেখাচ্ছি। এই করেই কখনও বেড়ার বাঁশের ওপর বসে, কখনও দাঁড়িয়ে ক্রমশ গুরুমহারাজের দিকে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝেই গুরুমহারাজ লাড্ডু, লজেন্স লুট দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা এতো দূরে যে আমাদের কাছ বরাবর তা আসছে না। বেশির ভাগটাই পড়ছে সামনে কীর্তনরত ভক্তদের মাঝখানে।

ওই সময়, লাফিয়ে লুট নেওয়াটাও আমাদের কাছে ছিল একটা বিশেষ আর্ট। এক একবার তো এমন হয়েছে যে, আমাদের আশেপাশের কাকা পিসী মাসী ঠাকমা দিদিমারা আমাদের ওপর বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু সেই লুট কিনা আমাদের থেকে শতহাত দূরে পড়ছে। এদিকে এগারোটা বেজে গেছে, পেট টুইটুই করছে। কিন্তু লাইন থেকে বেরনোর উপায় নেই।

সেই সঙ্গে একটা ব্যাপারে বিরক্তও লাগছে, বিশিষ্ট ভক্তরা গুরুমহারাজকে যখন কাপড় দিচ্ছেন, তক্ষুণি ব্যবস্থাপকদের কল্যাণে তাঁর বসার আসনের পাশেই একটা ঘেরা অংশে গুরুমহারাজ যাচ্ছেন,

আর নতুন কাপড় পরে আসছেন। বিরক্ত লাগার দুটো কারণ ছিল। এক তো, ভীষণ খিদে পেয়েছে, কিন্তু প্রণাম না করে খাব না। ফলে বারে বারে গুরুমহারাজের উঠে যাওয়ায় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় কারণ হল, মহারাজকে বারে বারে উঠিয়ে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। এমনিতেই তো প্রত্যেক প্রণতদের কাছ থেকে মালা নিয়ে নিজের মাথায় একবার ঠেকিয়ে সেটা তাকেই আবার ফিরিয়ে দেওয়া।

এটা আমাদের দেখে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বটে তবে এটা কিন্তু কম পরিশ্রমসাধ্য নয়! তার ওপর বারে বারে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, নতুন কাপড় তক্ষুনি বদল করার নির্দেশ।

ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ গুরুমহারাজ মেনে চলতেন। এটাও কিন্তু আমাদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়। একবার এক শিষ্যের বাড়িতে তিনি গিয়েছেন। সেখানে গৃহকর্তা একটা সময়সূচীর বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়েছিলেন; এই সময় প্রণাম, এই সময় কীর্তন, এই সময় ভাণ্ডারা ইত্যাদি। গুরুমহারাজ সে বাড়িতে ঢোকার আগে সেই বিজ্ঞপ্তিটা ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর ওই সময়সূচী অনুযায়ী তিনদিন অতিবাহিত করে এলেন।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। আঠারো বাড়ি হাউসের প্রণামের লাইনে দাঁড়িয়ে অগত্যা মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে দৃশ্যমান কিছু দেখছি আবার গুরুমহারাজকে দেখছি। আমাদের ওই সময়ের অবস্থাটা উপনিষদের দুই পাখির সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে, যাদের মধ্যে একটা পাখি কেবল স্থির হয়ে বসে দেখে, আর অন্যটা এদিক ওদিক ঘোরে, খায়, খানিক পরে ওই স্থির হয়ে বসা পাখিটার কাছে আসে, আবার দূরে সরে যায়। এই ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর আর সহ্য হল না। গ্লাস দুই তিন জল খেলাম। কিন্তু তাতে কী খিদে যায়। আবার পেট চুঁইচুঁই করতে লাগল।

আমাদের অবস্থাটা হয় তো গুরুমহারাজ বুঝতে পারলেন। কোথাও কখনও যা দেখিনি সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলাম। একজন পাথরের গ্লাসে করে শরবৎ বা কিছু গুরুমহারাজের হাতে দিলেন। তিনি সেটা মুখে না ঠেকিয়ে পান করলেন। তারপর বুড়ো আঙুলের নিচের দিকের পিঠ দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ করলাম আমার আর খিদে নেই। খিদে মরে যায় নি, খিদে নেই। কিন্তু আগের মতো উৎসাহ আছে। যেন এই মাত্র আমি নিজেই কিছু খেয়েছি। মুহূর্তের মধ্যে মনে পড়ে গেল মায়ের বলা ওই গল্প। স্বয়ং নারায়ণ যখন একদানা অন্ন গ্রহণ করেন, তখন বিশ্ববাসীর পেট ভরে যায়।

কিছুক্ষণ পরে আবার যখন খিদে পেয়ে গেল, তখন মনে মনে বলতে লাগলাম, 'ও মহারাজ তুমি কিছু খাও না, ভীষণ খিদে পেয়েছে যে।' খানিক পরে এক ভক্ত লুট দেওয়ানোর জন্যে একধামা সিঙ্গাড়া নিয়ে এলেন। সিঙ্গারা লুট হওয়ার পর সন্দেশ লুট হল। লুটের শেষে দেখলাম গুরুমহারাজ এক কুচি মুখে ফেললেন। তার পর থেকে যতক্ষণ প্রণামের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম ততক্ষণ আমার খিদে আর পায় নি।

মহাভারতের ওই কাহিনি যেদিন মায়ের কাছে শুনেছিলাম সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম, কী করে হয়? আজকেও প্রশ্ন, কী করে হয়! শুধু সে সময়ের প্রশ্নে ছিল নিছক কৌতূহল, কিন্তু আজকের প্রশ্নে রয়ে গেছে বিস্ময়ের সুর।।

(ক্রমশঃ)

ooo

# "এসো প্রাণ হরণো'

## শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

শতসহস্রকোটি প্রণাম জানিয়ে এই নতুনবছরে আমাদের পত্রিকার শুভযাত্রা শুরু করা যাক।

গুরু কে? মহাপ্রভু বলেছেন, 'কি বা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, চণ্ডাল কেন নয়? যেজন কৃষ্ণবেত্তা সেই গুরু হয়।" আর যাঁরা সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরাই সন্ন্যাসী। শুধু কর্মত্যাগী হলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সুখের আশায়, সুখের কামনায় নয়, দুঃখে, আঘাতে নয়, যিনি সুখে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি সন্ন্যাসী। মহাপ্রভুর মতে দ্বেষ-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকলেও তাঁকে সন্ন্যাসীর আখ্যা দেওয়া যায়। দ্বন্দ্বাতীত শুদ্ধ চিত্ত পুরুষ অনায়াসে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

মহাপ্রভু যখন নীলাচল উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন বাসুদেব সার্বভৌম ছিলেন নীলাচলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল যখন যাত্রা করলেন মহাপ্রভু, তখন পার্ষদদের ছেড়ে জগন্নাথ দর্শনের জন্য একাই দ্রুতগতিতে গিয়ে ঘোর আবেগের বশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করেই অচৈতন্য হয়ে যান, অপূর্ব দর্শন যুবক, আজানুলম্বিত বাহু, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা ভাব দেখে পাণ্ডাদের এড়িয়ে সার্বভৌম তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলেন, চৈতন্যদেবের নম্র ব্যবহার দেখে আর তাঁর পরিচয় জানতে পেরে সার্বভৌমও তাঁকে তাঁর এই যুবক বয়সের সন্ন্যাস ধর্ম যাতে বজায় থাকে সেই ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখলেন এবং সৎসঙ্গ, বেদান্ত পাঠ ইত্যাদির দ্বারা তাঁকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। এদিকে চৈতন্যের শিক্ষার মান সম্পর্কে তিনি অবহিত না থাকায় সাতদিন ধরে সার্বভৌম বেদান্ত ব্যাখ্যা সহকারে পাঠ করার পর জানতে চান তিনি কতটা বুঝতে পারলেন। মহাপ্রভু বললেন, "ব্যাসের সূত্র সূর্যের মত স্বপ্রকাশ, উজ্জ্বল সূর্যের মত সব বুঝতে পারি; আর যখন অদ্বৈত ব্যাখ্যা করেন তখন সূর্যকে যেমন মেঘ ঢেকে দেয় সেরূপ কিছুই বুঝতে পারিনা", —এই কথায় সার্বভৌম অবাক হলেন। তখন মহাপ্রভু আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করে বললেন, 'জীব আর ব্রহ্ম এক নয়; শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ বিভু, পূর্ণ ভগবান ব্রহ্ম; অনু জীবাত্মা তার দাস। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানকে ভালোবাসার জন্য ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন।

প্রভুর মুখে 'আত্মারাম', শুনে সার্বভৌম তাঁকে এর ব্যাখ্যা করতে বললেন। তখন প্রভু প্রথমে সার্বভৌমকেই ব্যাখ্যা করতে বললেন। উনি নয়রকম ব্যাখ্যা করলেন যদিও এই নয়রকম ব্যাখ্যা বোঝার লোক জগতে বিরল কিন্তু প্রভু আরও আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। সার্বভৌমতো বাকরুদ্ধ। তাঁর সকল

অহমিকা চূর্ণ হ'ল —এতক্ষণ তিনি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সম্মুখীন ছিলেন তা তিনি বুঝতে পারলেন। প্রভুর কৃপায় সার্বভৌম তাঁকে ষড়ভুজ মূর্তিতে দর্শন করলেন ও মায়াবাদ ত্যাগ করে প্রেমভক্তি লাভ করলেন এবং মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হলেন।

মহাপ্রভুই প্রথম হরিনামে জগৎ মাতালেন। কলির 'জীবের তারণ তরে' নাম সংকীর্তন শুরু করলেন; মানুষের হৃদয় বিগলিত হয়ে চোখে নামল জলের ধারা। আমাদের গুরুমহারাজ গাইতেন, "তুমি কী নাম আনিলে, কী সুধা ঢালিলে হৃদয় মাঝারে আসিয়া, তোমার নামেরই প্লাবনে ডুবিল ভারত অবনী যাইল ভাসিয়া।..."।,

গুরুমহারাজজীর মধ্যেও আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি। আমাদের এই নামে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য দয়াল গুরুও বেছে নিলেন সেই 'অমৃত লহরী'। তাঁর যাকিছু প্রেম সবটুকু বিলিয়ে দিচ্ছেন সবার জন্য। 'বলে হেসে হেসে প্রেম যেচে যেচে, তোদেরি লাগিয়া ফিরি দেশে দেশে "ওযে দেবতা ভিখারি মানব দুয়ারে দেখে যারে তোরা দেখে যা...", প্রায় ছাব্বিশ বছর হল আমরা আমাদের গুরুদেবের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত, তবুও তাঁরই নির্দেশিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি, "হরর্ণামৈব, নামৈব, নামৈব কেবলম্," —তাঁর এই মহামন্ত্র। আর তাঁর ভক্তরা যেখানে নাম করেন, সেখানে তিনি নিশ্চিত থাকেন, তিনি যে কথা দিয়েছেন, "মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ"।

ooo

"জপ ও জপের অর্থ বা মন্ত্র-দেবতার মূর্তিধ্যানসহ জপ করা বিধেয়। কেবলমাত্র জপও নিষ্ফল হয় না, তবে ধ্যানের সঙ্গে জপ করিলে মন স্থিরতার সহায়ক হয়। জপের উদ্দেশ্য মনকে অন্তর্মুখী ও স্থির করা। পৌণপুনঃ নিয়মিত জপ অভ্যাস করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধ হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে ধ্রুবাস্মৃতি বা মনের নিস্পন্দ ভাব ও লক্ষ্যস্থিরতা লাভ হয়।"

—শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

## MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
**Rangamati path, Bidhannagar, Durgapur-713212, West Bengal**
**(A DEDICATED CANCER HOSPITAL)**

### LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 10-10-2025 to 10-02-2026)

| DATE | RT. NO. | NAME | Bank/Cash | AMOUNT (RS.) |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2025 | 1776 | Chandana Dutta, Kolkata | Cash | 500.00 |
| 15-10-2025 | 1758 | A Well Wisher | Cash | 1000.00 |
| 01-11-2025 | | Soma Mitra | Bank | 1500.00 |
| 05-11-2025 | 683 | Sudeshna Dutta, Kolkata | Cash | 1000.00 |
| 05-11-2025 | 1687 | Anuradha Mukherjee, Kolkata | Cash | 5000.00 |
| 06-11-2025 | 1759 | Suchitra Bose, Kolkata | Cash | 5001.00 |
| 08-11-2025 | 1760 | A Well Wisher | Cash | 1001.00 |
| 14-11-2025 | 1780 | A Well Wisher | Cash | 5001.00 |
| 24-11-2025 | 1761 | A Well Wisher, Asansol | Cash | 2000.00 |
| 25-11-2025 | 1762 | Dr. Swapan Kumar Sinha, Kolkata | Bank | 5000.00 |
| 30-11-2025 | | David & Ander, Kolkata | Bank | 750.00 |
| 30-11-2025 | 1781 | Sabita Biswas | Cash | 5000.00 |
| 30-11-2025 | 1782 | Koushikee Bhattacharya | Cash | 500.00 |
| 30-11-2025 | 1783 | Prafullya Bhattacharya | Cash | 500.00 |
| 01-12-2025 | 1764 | Ghanty& CO.(Chemico), Asansol | Bank | 45,000.00 |
| 01-12-2025 | 1765 | Sushim Kumar Munshi ,U.S.A. | Bank | 20,000.00 |
| 11-12-2025 | 1766 | A Well Wisher | Cash | 1001.00 |
| 12-12-2025 | | David & Ander | Bank | 500.00 |
| 16-12-2025 | 1767 | A Well Wisher | Cash | 1500.00 |
| 17-12-2025 | | Soma Mitra | Bank | 1000.00 |
| 17-12-2025 | | Sruti Sinha through Ashis Kr. Sinha | Bank | 10000.00 |
| 19-12-2025 | 1784 | Shilajit Haldar | Cash | 1000.00 |
| 21-12-2025 | | Sruti Sinha through Ashis Kr. Sinha | Bank | 90000.00 |
| 23-12-2025 | 1768 | A Well Wisher, Asansol | Cash | 3000.00 |

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26-12-2025 | 1785 | Champak Chatterjee | Cash | 500.00 |
| 26-12-2025 | | David & Ander, Kolkata | Bank | 750.00 |
| 01-11-2025 to 01-02-2026 | | P. J. Chandra Finance, Kolkata | Bank | 8000.00 |
| 03-01-2026 | | Soma Mitra, Kolkata | Bank | 1000.00 |
| 06-01-2026 | 1769 | Syama Prasad Das, Asansol | Cash | 3500.00 |
| 08-01-2026 | 1770 | A Well Wisher | Cash | 900.00 |
| 08-01-2026 | 1786 | A Well Wisher | Cash | 2002.00 |
| 10-01-2026 | 1771 | A Well Wisher | Cash | 1001.00 |
| 25-01-2026 | 1787 | Sri Pavitrananda Brahmachari | Cash | 17800.00 |
| 28-01-2026 | 1772 | Pranati Bhattacharya | Bank | 5000.00 |
| 29-01-2026 | | David & Ander, Kolkata | Bank | 750.00 |
| 30-01-2026 | 1773 | A Well Wisher | Cash | 800.00 |
| 10-02-2026 | 1788 | Nilanjan Bhattacharya, Mumbai | Bank | 1,15,000.00 |
| | | | | |

**PLEASE SEND YOUR DONATION:-**

**For Donation in Indian Rupees:**

Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY**. Name of the Bank : **STATE BANK OF INDIA, MUCHIPARA BRANCH, DURGAPUR-713212, BURDWAN, WEST BENGAL.**
**ACCOUNT NO. 35626526750, BRANCH CODE: 6888, IFS CODE:SBIN0006888.**

**For Donation in Foreign Currency:**

Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.** Name of the Bank **STATE BANK OF INDIA, 11, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001, BRANCH CODE: 00691 ACCOUNT NO. 40283076692**
**SWIFT CODE: SBININBB104, IFS CODE: SBIN0000691**, Account Type: FCRA **(Savings).**

**For Baleswari Patrika**

**Shree Shree Mohanananda Samaj Seva Samity**
**SBI, SALTLAKE,**
**AE-MARKET BRANCH,**
**KOLKATA-64**
**A/c No. 10527195247– IFC CODE-SBIN0006794**

# দেবী বর্গভীমা

## শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

আসন্ন শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রথমেই জানাই শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে অনন্তকোটি প্রণাম। নববর্ষে মায়ের মন্দিরে মন্দিরে পূজার্চনা, হালখাতা সাড়ম্বরে পালিত হয়। ভারতের অগণিত দেব-দেবীর ন্যায় এই বাংলায় দেবী বর্গভীমা লৌকিক দেবীরূপে পূজিতা হন। দেবী বর্গভীমা প্রথমে সমাজের সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে পূজিতা হতে থাকেন। তারপর ক্রমশঃ সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষরাও পূজা করতে থাকেন। জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু, তারপর কৈবর্তরাজ ও বণিক সম্প্রদায়ের পর সর্বশেষ ব্রাহ্মণ পরিবার কিংবদন্তীর প্রচলন আছে।

মহাভারতীয় যুগে তাম্রলিপ্তে যখন ময়ূর বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন তখন ঐ বংশের দ্বিতীয় রাজা তাম্রধ্বজের নিয়োজিত এক জেলে বউ প্রতিদিন রাজ পরিবারে মাছ সরবরাহ করত। একদিন একটি বনের মধ্যে দিয়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে রাজবাড়িতে আসার পথে সে একটা জলে ভরা গর্ত দেখতে পায়। স্বভাববশত: সেখান থেকে কিছুটা জল নিয়ে মাছের ঝুড়িতে দেয়। হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে— জল ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ির মরা মাছগুলো সব জীবন্ত হয়ে উঠল। এই অলৌকিক ঘটনা রাজার কানে যায় এবং তিনি জেলে বৌ সহ অন্যান্যদের নিয়ে স্থানটি দেখার জন্য যান। সেখানে দেখতে পান জলে ভরা গর্তের জায়গায় একটি বেদী এবং তার উপরে দেবীমূর্তি তারপর থেকে রাজা মাবর্গভী মায়ের পূজার ব্যবস্থা করে দেন। এইরূপ মধ্যযুগীয় অনেক কিংবদন্তী আছে। যা স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়।

তমলুক শহরবাসীর কাছে বর্গভীমা অধিক পূজিতা হন। প্রত্যহ বহুনারী পুরুষ দেবীর নিকট অঞ্জলি দিয়ে পূজা নিবেদন করেন। প্রতিদিন সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেবীর ঘুম ভাঙিয়ে স্নানপর্ব পালিত হয়। তারপর নতুন শাড়ি পরিয়ে সোনা ও রূপার বিভিন্ন গহনা পরানো হয়। এরপর ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করেন। দুপুরে দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময়েই সন্ধ্যার পূজা শেষ করা হয়, সেই সময়ে বহু ভক্ত উপস্থিত থাকেন চরণামৃত পান করেন। রাত আটটা নাগাদ দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করে নিদ্রার ব্যবস্থা করা হয়। শয়ন করানোর আগে দেবীর গহনা খুলে নেওয়া হয়।

বিশেষ বিশেষ দিনে দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। যেমন নববর্ষের প্রথম দিনে, বিপত্তারিণী ব্রত, মঙ্গল সংক্রান্তি ব্রত, শারদীয়া দুর্গাপুজোর অষ্টমী ও নবমী তিথি পৌষ সংক্রান্তি ইত্যাদি। সন্তানবতী জননীরা

শারদীয়া ষষ্ঠীর দিনে উপবাস করে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে পুজো দিয়ে দেবীর চরণামৃত পান করেন। তারপর সপরিবারে পূজার প্রসাদ গ্রহণ করেন। নবমীর দিন মানতকারীরা দেবীর কাছে ছাগবলী দিয়ে থাকেন।

পৌষ সংক্রান্তির দিনটিকে দেবীর বিশেষপূজার দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। বিরাট মেলা বসে। তমলুকে ঐদিন প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। অন্নভোগ দাখিল করতে চাল, বিভিন্ন সবজী আলু, মশলা জ্বালানী ও মাছ কিনে দিতে হয়। ভোগগ্রহণকারীদেরকে মন্দির কর্তৃপক্ষকে দক্ষিণা দিতে হয়। দেবী যে ভীষণ জাগ্রতা এবং বিপদের সময় ভক্তদের রক্ষা করেন—এই নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। এখানে দুটি কাহিনী তুলে ধরলাম—

(১) তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সল্ট এজেন্সি ছিল। সে সময়ে সল্ট কোম্পানীর নায়েব তাঁর নাতির অন্নপ্রাশনের জন্য দশমণ সন্দেশের বায়না দেন। হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো, অন্নপ্রাশন হবে না, সন্দেশ লাগবে না। এদিকে সন্দেশ প্রস্তুত। মান্না মশাই দুঃখে কাতর হয়ে বর্গভীমার পাদদেশে ধর্ণা দিয়ে পড়লেন, 'মা, তুমি কৃপা করো, এখন আমি কী করব?' রাতে স্বপ্নে বর্গভীমায়ের কণ্ঠে শুনতে পেলেন তোর কোনও ভয় নেই। পরদিন সকালে সন্দেশ নিতে নায়েবের লোক এসে হাজির। মান্না মশাই সেই সন্দেশ বিক্রয়ের অর্থে দেবীর গলায় সোনার মুণ্ডমালা তৈরী করে দিলেন। দেবীর স্বর্ণকলস ও গহনা পত্র অনেকবার চুরি গেছে, কিন্তু মুণ্ডমালা কখনো চুরি হয়নি।

সেই মুণ্ডমালার ছাঁচ আজও মান্নামশাইয়ের বাড়িতে আছে। মান্নামশাই বংশধরদের আদেশ দিয়ে গেছেন, যদি মুণ্ডমালা চুরি যায় তারা যেন পুনরায় তা তৈরি করিয়ে দেন।

এক ব্যক্তির পাঁচ ছ বছরের ছেলে দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ভুগে আসছে। অনেক চিকিৎসা করেও কোনও উন্নতি হয়নি। তিনি বিচলিত হয়ে তাঁর গুরুদেবকে জানালে গুরুদেব পরামর্শ দেন যে, গর্ভবীমায়ের পুজো দিয়ে সেই পুজোর ডালি যেন তার অসুস্থ সন্তানের মাথায় ছোঁয়ানো হয়, তাহলেই সুফল পাওয়া যাবে। সেই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করায় অসুস্থ সন্তান কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে।

নববর্ষের শুরুতে হে গুরদেব তোমায় নমি নমি,
তব চরণের ধূলি শিরোপরে লয়ে হৃদয়ে উঠুক আনন্দধ্বনি।

সম্পাদকীয়

# সুস্বাগতম্ ১৪৩৩

ঘড়ির কাঁটা ঘুড়েই চলেছে নিজস্ব গতিতে যেহেতু থামতেতো সে শেখেনি; আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সময়ের সঙ্গে আবর্তিত হচ্ছি তালে তাল মিলিয়ে —এটাইতো নিয়ম। দেখতে দেখতে একটা বছর আবার অতিক্রান্ত হল, যা ছিল গতকাল, আজ তা আরও পিছনে সরে যেতে থাকবে, তা হবে অতীত। এই অতীতের স্মৃতি আমরা আঁকড়ে ধরে থাকবো? নাতো, আগামীতে দিতে হবে গা ভাসিয়ে। কবিগুরু বলেছেন, "কথা কও, কথা কও অনাদি অনন্ত অতীত কেন বসে চেয়ে রও....", তাহলে কী অতীত কথা বলবে? বলবে না— শুধু স্মৃতির ঝোলার ওজন বাড়বে।

আজ রাত পোহালে কালই পূর্বদিগন্তের রক্তিম সূর্য্য সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে বলবে, 'আমি', 'আমি', ঘোষণা করছি ১৪৩৩ সালের। আমরা প্রতিদিনের মত 'জবাকুসুম সঙ্কাশং..." মন্ত্রে তাঁকে বরণ করে নেব— এটা যে আমাদের নিত্যকর্ম পদ্ধতির মধ্যে পড়ে, গুরুমহারাজ যে আমৃত্যু আমাদের সকল কর্মের গণ্ডী বেঁধে রেখে দিয়েছেন। তবে আজ তাঁর উদ্দেশ্যে গাইতে ইচ্ছে করছে "কোথায় গেলি মাগো আমায়, খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে...", তাঁর এই ভুলিয়ে রেখে যাওয়ারও যে বয়স একবছর আরও বেড়ে গেল। কার কাছে কখন তিনি পুনরায় পারের তরী নিয়ে দণ্ডায়মান হবেন সেটাতো তাঁরই ইচ্ছাধীন। এখন তাহলে আমাদের কী কর্তব্য? —ঐ পাখি হয়ে গুরুনামের মাস্তুলে বসে থাকা, নাহলে, "বৃথা ওড়া, নড়াচড়া কূল পাবিনা আঁধারে"-র অবস্থা হবে।

একসময় ছিল যখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ শ্রীদেহে বিরাজমান ছিলেন আর আমরা অধীর আগ্রহে নববস্ত্র পরিহিতা হয়ে, হাতে মালা নিয়ে, তাঁর শ্রীচরণে নতমস্তক হওয়ার জন্য প্রাতঃকাল থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, যত লাইন কাছে এগোতে থাকত মনে মনে গুরুনাম জপতে জপতে কামনা করতাম, 'প্রভু, নামাও, নামাও, নামাও, তোমার চরণ তলে....", যতক্ষণ লাইনে ততক্ষণ দর্শন, আজ মনে ভাবি সেটাই ছিল ভাল মনে থাকতো একাগ্রতা— মাঝে মাঝে প্রণাম থামিয়ে লুঠ আর তা গ্রহণের জন্য হুড়োহুড়ি—সেই দেখে তিনি কতইনা হাস্যমুখর হতেন; আজ ভাবি আমরা যে কত বোকা ছিলাম, যাঁকে চাইবার কথা তাঁকে না চেয়ে— আসল ফেলে নকলের পিছনে ছুটেছি, আজ বুঝতে পারছি, তখন আমরা 'চাহিতে জানতাম না' দয়াময়কে। বৈশাখ মাস আরও তাৎপর্যপূর্ণ এইজন্য যে কবিগুরুর জন্মদিনও এইমাসে—যাঁর লিখে যাওয়া বহু গান তিনি ভক্তি ভাবনার রূপে পরিবেশন করেছেন তাঁর কীর্তন আসরে আমাদের সবার জন্য। তাই বরাবরের মত এইবছরেও আমরা তাঁকে স্মরণ করে ভক্তি অর্ঘ্য জানাই। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গচ্যুতির অভাব কোনওদিনই পূরণ হবার নয়, তবু আসুন আমরা সম্মিলিত ভাবে তাঁর রাতুল শ্রীচরণপদ্মতলে আমাদের বিনম্র ভক্তিপূর্ণ প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা জানাই, "যে জন আমাদের মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে, আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে; এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও...."।।